6th October, 2015 * Editor: Dipankar Dutta * Email: deepankar_dutta@yahoo.co.in * 9891628652 * New Delhi

পাঠক, এখন, রোমের চত্বর থেকে দূর জানালায় চোখ রেখে দেখা গেল দ্যুতি নিভে যায়
ক্যাথলিক মিশনের কাছে আমি ভারতের অপুষ্ট শিশুর জন্য গুঁড়ো দুধ চাইবো আয়াসে
ঊনচল্লিশ পোপের মৃত্যুর পর কূটজ্ঞানে চল্লিশ পোপের জীবাণুমুক্ত আয়ু ফিরে আসে-
এই বোধে। উৎপলকুমার বসু

এই সংখ্যায়

Page 1 : কথোপচারণ : মলয় রায়চৌধুরী Vs অরূপ চৌধুরী, দীপঙ্কর দত্ত স্বপন রায় Vs মৌলিনাথ বিশ্বাস

Page 2 : স্বকাব্যকথন : কৌশিক চক্রবর্তী, অভি সমাদ্দার, রাধে ঘোষ, রিমি দে, অভিজিৎ মিত্র

কাব্যানালিসিস : রমিত দে

Page 3 : কবিতা : বীরেন ডঙ্গওয়াল, বারীন ঘোষাল, রবীন্দ্র গুহ, ফারাহ্ সাঈদ, প্রণব পাল, রঞ্জন মৈত্র, জপমালা ঘোষরায়, সব্যসাচী সান্যাল, অনিন্দ্য রায়, অগ্নি রায়, পীযূষকান্তি বিশ্বাস, ভাস্বতী গোস্বামী, নীলাজ চক্রবর্তী, দীপঙ্কর দত্ত

Fuck the bastards of the Gangshalik School of Poetry

কথোপচারণ

মলয় রায়চৌধুরীর বৈঠকখানায়
ঘুসপ্যায়েঠ করেছেন অরূপ চৌধুরী ও দীপঙ্কর দত্ত

দীপঙ্কর দত্ত : মলয়দা, *অর্বাচীন* পত্রিকার ধুলো, ২০০০ সংখ্যায় আপনি দগ্ধ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে আমার যে সাক্ষাৎকারটা নিয়েছিলেন, সেটার অধিকাংশ কপি নাকি বাইন্ডারের গুদোমের ধেড়ে ইঁদুরদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আমাদের এই সাক্ষাৎকারটা যাতে মনুষ্যপদবাচ্যদের কাছে পৌঁছয় তার জন্য আজ অনেক পাঁজি- পুঁথি ঘেঁটে বসতে হচ্ছে।

মলয় রায়চৌধুরী : হ্যাঁ, কেদার ভাদুড়ীর যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলুম তার তুলনায় তোমারটা তেমন প্রচার পায়নি। শর্মী পান্ডে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে- তুলে কতই বা এসব হ্যাঙ্গাম পোয়াবে ! যা করেছে ওই যথেষ্ঠ। এবার তুমি ওটা *জিরো আওয়ার* থেকে পুস্তিকার আকারে বের করো।

দীপঙ্কর : আপনাকে বিব্রত করার মতন প্রশ্নও থাকছে। হয়তো আপনার পক্ষে সম্মানহানিকরও মনে হতে পারে।

মলয় : নো প্রবলেম। জাস্ট গো অ্যাহেড।

দীপঙ্কর : কলকাতার কোনও এক স্টেজে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পা ছুঁয়ে আপনার প্রণাম করার একটা খবর পেয়েছিলাম দিল্লীতে বসে। বছর কয়েক আগেকার কথা। দিল্লীতে খবরটা রটিয়েছিল নব্বুয়ের তমিস্রাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ও তখন দিল্লীতে ইউরেকা ফর্বসের সেলস একজিকিউটিভ।

মলয় : হ্যাঁ, বাংলা অ্যাকাডেমিতে সবায়ের সামনে করেছিলুম প্রণাম। কার্য হলেই কারণ থাকতে হবে ভাবাটা ভুল। কারণ হলেও কাজ হতে পারে। মুম্বাই থেকে কলকাতা এসে আমার মধ্যে *'আমি মলয় রায়চৌধুরী '* টাইপের ফ্যারাওসুলভ ইডিয়সি দেখা দিয়েছিল। কিছুটা সাহিত্যজনিত, আর কিছুটা সে সময়ে নাবার্ডে চাকরির দৌলতে জেলায়- জেলায় হাতজোড়- করা রাজনীতিকদের প্রশ্রয়ে। ওই মডার্ন আমিত্বের দর্শনকে নিকেশ করে নিজের কাছে নিজের ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করা জরুরি ছিল। বরিশা- বেহালার, হালি শহরের সাবর্ণ চৌধুরী জ্ঞাতিদের লক্ষ্য করেছিলুম যে কারোর ব্যক্তিগত গর্ব নেই। ওনাদের গর্বটা পারিবারিক। সাবজেকটিভ মলয়কে নস্যাৎ করার বাংলা অ্যাকাডেমিতে ওটাই ছিল সুযোগ।

দীপঙ্কর : অনেক পরে *চীৎকার সমগ্র* কবিতার বইটা হাতে এলে দেখলাম তার উৎসর্গপত্রে লেখা "শ্রী আল মাহমুদ, শ্রী শঙ্খ ঘোষ, শ্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আধুনিকতার শেষ বাঙালি ত্রিমূর্তিকে।" এইসব পেন্নাম, উচ্ছুগ্যর পেছনে কী মনোভাব কাজ করেছে ?

মলয় : আবার তুমি কার্যের আগে কারণ খুঁজছো ! অধুনান্তিকতা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করার পর অনেকেই আমাকে বাঁকবদলটার কথা জিজ্ঞেস করতেন। তাই সুপরিকল্পিত পোস্টমডার্ন কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রেই আমি সেটা দেখিয়ে দিতে চেয়েছি। আরেকটা কারণ ছিল। আমার বরিশা- বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী জ্ঞাতিদের বাড়ি যাতায়াত করে টের পাই যে কলকাতার এই আদি পরিবারের সদস্যরা মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গের নৈতিক পতন ঘটিয়েছে রিফিউজিরা এসে। এনারা তিনজনেই বাঙাল। তুমি নিজে বাঙাল বলে আসল চোটটা মিস করেছ। বাঙালরা সাধারণত বই পাঠালে অ্যাকনলেজ করে না। কেবল শঙ্খ ঘোষ প্রাপ্তি স্বীকার করেছিলেন। বাকি দুজন প্রমাণ করেছেন তাঁরা দুই বঙ্গের কালোয়াত। এনারা মহাকরণপন্থী, ধর্মে আছি- জিরাফে আছি, আর সাম্প্রদায়িক, এই তিনটি পচনমঞ্চের আস্ফালক। তুমি বোধহয় ভাবছ আমি কিছু পাবার তালে আছি। না, লেখালিখির জগতে আমি যেখানে আছি, তারপর আর কোনো কিছু অ্যাচিভ করার নেই। আমি কোনও পুরস্কার নিই না, কোনও সম্বর্ধনা নিই না, কোথাও গিয়ে কোনো ভাষণবাজি করি না। পাঠককে দেবার জন্যে আমার মুদ্রিত লেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই। *কবিতা সমগ্র* প্রকাশের রেশারেশিটার উৎসও হল রিফিউজিদের ইনসিকিউরিটির বোধ। *চিৎকার সমগ্র* তার কাউন্টার ডিসকোর্স। সেদিন টিভিতে দেখলুম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলছেন, "ময়মনসিংহের লগে প্রাণডা বরোই কান্দে।" হরপ্রসাদ সাহু বলল, "কাঁদেই যদি তো এলেন কেন এখানে।" এই হল মডার্নত্ব। আমারও মনে হলো যে, গুজরাতে মুসলমানদের ওপর এই যে নাদির শাহি অত্যাচার হল, কেউ কি পাকিস্তানে পালিয়েছে ? যায় নি। কারণ তারা এখানেই বিলং করে।

দীপঙ্কর : *চিৎকার সমগ্র* বইটির শুরুতেই আপনি ঘোষণা দিয়েছেন, "এই টেক্সটগুলোর কারুর কোনো কপিরাইট নেই। যে যেমন ইচ্ছে ছাপতে পারেন, পড়তে পারেন, চ্যাঁচাতে পারেন, ছিঁড়তে পারেন।" সাপোজ আপনি কোনও কবিতায় দ্যাখাতে চাইলেন শিব, আর

পাঠক তার ডিকন্সট্রাকটিভ রিডিং- এ দেখলেন বাঁদর — এই ব্যাপারটা সত্যিই কতটা আপনাকে মনোক্ষুন্ন করে না ? একজন ডিকন্সট্রাকটিভ পাঠক আলটিমেটলি তার নিজস্ব আর্গুমেন্ট বা ন্যারেটিভের টোটালাইজেশানে কি যান না ?

মলয় : আমার কাছে কপিরাইট কনসেপ্টটাই সোনাগাছির ব্যাপার বলে মনে হয়। একটা বইয়ের স্যাকরোস্যাংক্ট হবার ধারণাটা এনেছিল পর্তুগিজ পাদ্রিরা। সাম্রাজ্যবাদীরা আসার আগে মোগলরাও অমন আইন বানায়নি। আর শব্দের মধ্যে কবির একমাত্রিক প্রতিস্ব ঠুসে দেওয়ার ধারণাটা এনেছিল বদলেরিয় আধুনিকতাবাদ। তারপর উনিশ শতক থেকে ইউরোপে শুরু হয়ে গেল ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনা। নেটিভরা তার নকল করতে লাগল। ভাষা, শব্দ এগুলো কৌমসমাজের। ইউরোপে শব্দেরা একমাত্রিক। হরিচরণ খুললেই টের পাবে বাংলাভাষা কত ব্যাপকভাবে বহুমাত্রিক। *কবি কি বলিতে চাহিতেছেন* বলে কিছু হয় না। যা হয় তা হল *কবিতাটি পাঠককে কি বলিতেছে* । তার মাঝে আমার নাক গলাবার ভূমিকা নেই কোনও। গ্রিক পুরাণে প্রতিটি চরিত্রের অপরিবর্তনীয় গল্প পাবে। আমাদের দেশে একটা চরিত্র সম্পর্কে নানা গল্প পুরাণগুলোয় পাবে। পাঠক সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাকে সিলেবাস- অনুমোদিত মানে বইতে কয়েদ করা যায় না। মডার্ন তত্ত্ববিশ্বটা ইউরোপ থেকে এসেছিল, একথাটা মনে রাখলে মগজে ধোঁয়া জমার সম্ভাবনা থাকবে না।

অরূপ চৌধুরী : আচ্ছা মলয়দা, আমার তো মনে হয় মডার্নিটি এবং পোস্টমডার্নিটি অনেক বেশি কমপ্রিহেনসিভ কনসেপ্টস যা ৎসাইটজাইস্টের অনেক কাছাকাছি। অপরপক্ষে মডার্নিজম এবং পোস্টমডার্নিজম স্টাইলস অব রিপ্রেজেনন্টেশন এবং স্পেসিফিক ডকট্রিনের কথাই বলে। ফ্রেডেরিক জেমিসনের অনুসারে পোস্টমডার্নিজম স্পেসিফিক স্টাইলিস্টিক ফিচারসকে প্রত্যাখ্যান করে। আবার ওদিকে পোস্টমডার্নিজম টেক্সটে আপনি এক জায়গায় লিখেছেন, "স্বাধীনতা এবং যুক্তির প্রগতির ধারণা অবলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অধুনান্তিকতা এনেছে স্টাইল ও স্বাচ্ছন্দ্য।" চিন্তাবিদদের মতামতের এই যে পরস্পরবিরোধিতা, একেই কি বহুত্বময় বলা যেতে পারে, যা কিনা পোস্টমডার্নের একটা বিশেষ প্রতর্ক ?

মলয় : মডার্ন কে তত্ত্ব, কনসেপ্ট, ডকট্রিনের সীমায় আটকানো যায় কেননা ওটা টাইম বা সময়- নির্ভর বক্তব্য। কিন্তু পোস্টমডার্ন ভাবনাটা স্পেস বা পরিসর সম্পর্কিত। তার কোনো সীমাবন্ধন নেই। যেহেতু স্পেসের কথা হচ্ছে, তা আলাদা আলাদা হতে বাধ্য। সুতরাং তুমি নিজের স্পেসগুলোর কথা ভাবো। জঁ ফ্রাঁসোয়া লিয়তার, ফ্রেডেরিক জেমিসন, টেরি ইগলটনকে সেক্ষেত্রে তোমার মনে হতে পারে ফালতু। তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি, দীপঙ্কর, গৌতম, রবীন্দ্র গুহ তো পোস্টমডার্ন কবিতা লিখছ। তা সত্ত্বেও তোমাদের যে- যার স্পেস আলাদা। আবার দেখবে যে সমীর রায়চৌধুরী, ধীমান চক্রবর্তী, অরবিন্দ প্রধান, প্রভাত চৌধুরী, বারীন ঘোষাল প্রমুখ যাঁরা পোস্টমডার্নকে নানা দিক থেকে দেখছেন, তাঁদের সঙ্গে তোমাদের মিল বহুক্ষেত্রে ঘটছে না। বৈভিন্ন জিনিসটা বিরোধিতা নয়। চীন দেশটার দিকে তাকালেই পোস্টমডার্ন ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারবে। নিজের দেশ সম্পর্কে ওদের কাজ কারবারটা অ্যানার্কি নয় নিশ্চই।

দীপঙ্কর : অ্যানার্কিজমের দৃষ্টিভঙ্গিতে শাসন- ক্ষমতা তো সব সময়ই নিন্দনীয়। কিন্তু পোস্টস্ট্রাকচারালিস্ট অ্যানার্কিজমে আবার ক্ষমতাবাদী সংস্থা যুগপৎ সৃষ্টিশীল এবং ধ্বংসাত্মক। আমাদের আর্থ- সামাজিক- রাজনৈতিক- সাংস্কৃতিক এবং ধার্মিক কাঠামোয় স্ট্রাকচারালিজমের সংজ্ঞা, রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্য কী ? পোস্টমডার্ন বাংলা লেখালিখিতে এই নৈরাজ্যবাদ কতটা লক্ষ্যণীয় ?

মলয় : তুমি একটা হাইপথেসিসের সঙ্গে একটা অ্যাপলায়েড ব্যাপার মেলাতে চাইছ। আরেকটা ব্যাপার মনে রাখছো না যে ইউরোপ-আমেরিকার ভাবুকরা সবকিছুর জন্য খৃষ্টধর্মের ঈশ্বরকে মগজে রাখেন। ওদের প্রতিটি ভাবনা দুম করে আমাদের চৌকাঠে এসে ধাক্কা খায়, এই জন্যে যে, আমরা ঈশ্বরহীন হিন্দু, ধর্মহীন হিন্দু, হিন্দুত্ব- বিরোধী হিন্দু, একাধিক ঈশ্বর বিশ্বাসী হিন্দু হতে পারি, যা ওরা পারে না। নেশন, স্টেট, রুলার এসব ধারণা এসেছে খৃষ্টধর্মী ইউরোপ থেকে। অ্যানার্কিজম বলতে কিন্তু নিহিলিজম বোঝায় না। প্রশ্ন হলো যে, অ্যানার্কিজম বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ সরকার, আইন, পুলিশ বা যে কোনো আধিপত্য- বর্জিত সমাজ, তা কি সম্ভব ? না, সম্ভব নয়। মানব সমাজে ক্ষমতাবাদ আর ক্ষমতাধারী সংস্থা তো থাকবেই, কেন না জ্ঞানই ক্ষমতা। সব সংস্থাই কিছু বানায় কিছু ভাঙে। যে সূক্ষ্ম টানাপোড়েন মানুষে- মানুষে চলে, তার ভেতরে নির্মাণ- বিনির্মাণের কাজ চলতে থাকে। সনাতন ভারতীয় ভাবনায় সৃষ্টি- স্থিতি- প্রলয়ের ধারণাটা সে হিসেবে যুৎসই। *আমাদের* বলতে তুমি যে পরিসর চিহ্নিত করতে চাইছ তা উত্তরঔপনিবেশিক। উত্তরঔপনিবেশিক ভারতে স্থিতিটা ঔপনিবেশিক স্থিতির মতন নয়। এখানে অজস্র ছোট- ছোট স্পেস তৈরী হয়েছে, যার একটা থেকে আরেকটা সব ব্যাপারেই আলাদা। যেমন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা গুজরাতের হিন্দুর মতন নয়। আবার কর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দাঙ্গাহাঙ্গামা সত্ত্বেও গুজরাতিরা পশ্চিমবঙ্গের থেকে পৃথক। দিল্লিতে যেমন জামিয়া মিলিয়া, জে এন ইউ আর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তিনটে বিভিন্ন ভাবনা- স্পেস। আর ওই যে *নৈরাজ্যবাদ* শব্দটা ব্যবহার করলে, ওটা বাংলাভাষায় আগে ছিল না, ইংরেজরা এনেছে, অ্যানার্কিজমের প্রতিশব্দ হিসেবে। একজন লেখকের নির্মাণ ঘটে, সে যেসমস্ত স্পেসগুলোয় রিসাইড করে তা দিয়ে। সুতরাং পোস্টমডার্ন লেখালিখিতে যা থাকে তা নৈরাজ্য নয়। লেখকের স্পেসগুলো তার লেখাকে ইনভেড করে। প্রবাল দাশগুপ্ত এই স্পেসটাকে তাই বলেছেন, *সাজানো বাগানের পরের স্টপ* । ন্যারেটিভ ফলত হয়ে যাচ্ছে ডিন্যারেটিভাইজড, মুক্ত আঙ্গিক, ছেতরানো, আকস্মিক, মৌজমস্তিভরা। একই সঙ্গে পাবে নাইডু, জয়ললিতা, লালু যাদব, চৌটালা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পাঁচতরকারি।

অরূপ : আইডিওলজির ভস্মাবশেষ থেকেই নাকি পোস্টমডার্নের জন্ম ! যে রকম বদরিলারের ভাষ্যে ইতিহাসও মৃত। কিন্তু টেরি ইগলটনের মতে এটা শুধুমাত্র পোস্টমডার্ন থিওরিস্টদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমেরিকান ইভানজেলিক্যালস, ইজিপশিয়ান ফান্ডামেন্টালিস্টস, আলস্টার ইউনিয়নিস্টস কিম্বা ব্রিটিশ ফ্যাসিস্টসদের ক্ষেত্রে খাটে না, একজন বাঙালি কবি- ঔপন্যাসিক হিসেবে আপনার কি বক্তব্য ?

মলয় : তুমি সম্ভবত একজন গ্রন্থকীট। তা- ও ইউরোপ আমেরিকায় কে কি বলছে, তাকে গুরুত্ব দিচ্ছ। একটা কথা সবসময় মনে রাখা দরকার যে, পোস্টমডার্ন ভাবনাটার জন্ম লাতিন আমেরিকায়, যে অঞ্চলে মডার্নিজমের যাবতীয় আইডিওলজি অ্যাপলাই হয়েছে আর লাথড়া খেয়েছে। বই পড়ে যে- জ্ঞান সঞ্চয় করছ, তা নিয়ে তাত্ত্বিক তর্ক- বিতর্ক না করে, তা নিজের চারপাশের প্রেক্ষিতে বিচার করো। টেরি ইগলটনটা তো ফালতু, আমাদের দেশের সরকারি মার্কসবাদীদের ক্লাবের লোক। সোভিয়েট রাশিয়া ডুবকি খেয়ে গেল কেন ? ডুবকি খেতেই অনেক বামপন্থী বাংলা পত্রিকা লাটে উঠল কেন ? লাটে উঠতেই তার আদর্শবাদী লেখকরা মহাকরণের খুদকুঁড়ো জোটাতে গেল কেন ? কোথায় কোন আইডিওলজি এদেশে টিকে আছে দেখাও তুমি ? পশ্চিমবঙ্গে একটা সুতো ধরে টানলে হাজার- হাজার হিন্দু ইভানজেলিক্যালস, মৌলবাদী আর ফ্যাসিস্ট বেরিয়ে আসবে যাদের গায়ের লেভেল ভিন্ন।

দীপঙ্কর : আপনি কি সত্যিই মনে করেন সাতচল্লিশ পরবর্তী ভারতবর্ষে কোনো বিপ্লব হয় নি ? আমার তো মনে হয় নকশাল, তেভাগার মতো আন্দোলনগুলো আজও জনমানসে তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল। বিপ্লবের ব্যর্থতাও তো হিস্টরিকাল প্রগ্রেসে কন্ট্রিবিউট করে ! পোস্টমডার্নের ভাবনা অনুযায়ী ম্যানিফেস্টোর দিন তো ফুরোলো ! বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাও কি ফুরোলো ? নাকি ছোট- ছোট স্থানিক আন্দোলনই আজকের যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্য ধর্তব্য ?

মলয় : তুমি কামতাপুরি, পিপল্স ওয়ার গ্রুপ, উলফা, বজরং দল, এন. এস.সি.এন, টি.এন.ভি.এফ, জয়েস- এ- মোহম্মদ, জে.কে.এল.এফ, রণবীর সেনা, সিমি — এদের বাদ দিচ্ছ কেন ? এরা তো জনমানসে আরো টাটকা ! আসলে ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ছিল বিপ্লব। তুমি বলছ আন্দোলনের কথা। প্রাক্তন নকশালগুলো এখন কী করে খোঁজ নিয়েছ ? আর তেভাগা ? পশ্চিমবঙ্গের গোটাকতক পঞ্চায়েত ঘুরলেই টের পাবে সিপিএম- এ কেন গোষ্ঠীযুদ্ধ চলছে, কেন তৃনমূল, আর.এস.পি, এস.ইউ.সিদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চলছে। সবাই সব ম্যানিফেস্টো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে সমাজের মল্লভূমিতে ছোট- ছোট টাল সামলাতে নেমেছে। যুগধর্ম ধারণাটাও ওয়েস্টার্ন। হওয়া উচিত পরিসর- চারিত্র্য। যা ঘটছে ভিয়েৎনামে, চিনে। আমাদের মতন মাল্টিকালচারাল দেশে বিপ্লবের পাশ্চাত্য ধারণা অচল। আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে ফি বছরের খুনোখুনিতে এস্ট্যাবলিশমেন্ট পাল্টায় আর নতুন অধিপতি তাকে বলে বিপ্লব।

অরূপ : আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা পরবর্তী নিও কলোনিয়ালিজম, যা সরকারি শ্বেতপত্র টু প্রিন্ট মিডিয়া টু ইলেকট্রনিক মিডিয়া তক ছড়িয়ে রয়েছে, তা- ই কি পোস্টমডার্ন অবস্থার উদগাতা ? এই কলোনিয়ালিজমকে কি নিও ইমপিরিয়ালিজমেরই নামান্তর বলা যায় ?

মলয় : পোস্টমডার্ন অবস্থা কেবল সরকার আর মিডিয়ার অবদান নয়। তা উত্তরঔপনিবেশিক ধাক্কাধাক্কি উপজাত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জনগণকে এমন সব সুড়সুড়ি দিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদীরা যে, তার গরল এখন গা ফুটে বেরুচ্ছে। জমি- জমা- চাকরি- পঞ্চায়েত

বাইরের লোকেরা এসে দখল করে নেয়ায় রাজবংশীরা *বাঙালি সাম্রাজ্যবাদের* কথা বলছে। শতকের পর শতক পাশাপাশি থেকেও সাঁওতালি ইত্যাদি শব্দ বাংলাভাষায় গ্রহণ না করায় আদিবাসীরাও বলছে *বাঙালি সাম্রাজ্যবাদের* কথা। নব্য বাঙালি সাম্রাজ্যবাদীদের দৌরাত্যে কল- কারখানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালিয়েছে অন্য রাজ্যে। আর এন আর আইরা কেউ পশ্চিমবঙ্গমুখো হতে চায় না। পোস্টমডার্ন বলছে মাইক্রোলেভেল থেকে আরম্ভ করো: পাড়া থেকে, শহর থেকে, রাজ্য থেকে, দেশ থেকে দুনিয়ার তত্ত্ববিশ্বের দিকে এগোও। মডার্ন তত্ত্ববিশ্বে প্রেক্ষিতটা ছিল বিশ্ব। তাই সবকিছুর দায় বিশ্বের ওপর চাপাবার ধান্দা। প্রতিটি মাইক্রোলেভেলের নিজস্ব পোস্টমডার্ন ম্যানিফেস্টেশন্স হয়। যেমন ধরো চীনের 'বাজার ইম্পিরিয়ালিজম', সৌদি আরবের 'রিলিজিয়াস ইম্পিরিয়ালিজম', আমেরিকার 'মিলিটারি ও কালচারাল ইম্পিরিয়ালিজম', জাপানের 'ইলেকট্রনিক ইম্পিরিয়ালিজম', ইত্যাদি আমাদের মাইক্রোলেভেলকে ইনভেড করে ঠিকই, কিন্তু সেসব কারণে ঘাস বা আমের আঁটি খেয়ে বেঁচে থাকার অধিবাস্তবতা হয় না।

দীপঙ্কর : পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে আজকাল দেখছি এক ধরণের দার্ঢ্যতাহীন, আনকনসার্নড, আলুলায়িত, মেদুর মেদুর কবিতা জন্ম নিচ্ছে যার সমালোচনায় যাওয়াটা চট করে সম্ভভ হয় না কারণ এগুলি সোকল্ড পোস্টমডার্ন কন্ডিশনে উৎরে যাচ্ছে। মোহিতলাল যেমন বলেছিলেন আজকাল কাহাকেও মূর্খ বলিবার যো নাই কেন না য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সকলেই আজ গ্র্যাজুয়েট। এইসব পোস্টমডার্ন জেনানা কবিতা সম্পর্কে আপনার কখনো কিছু মনে হয়েছে ?

মলয় : এটা ঘটছে কিছু ইডিয়ট সম্পাদকের জন্যে, যারা শুধু অপ্রকাশিত লেখা ছাপতে চায়। গল্পের ব্যাপারেও এটা ঘটছে। পত্রিকা ছাপা হয় তিনশ বা পাঁচশ। ফলে সব পাঠকের কাছে পৌঁছোয় না একটা লেখা। সম্পাদকদের উচিত বিভিন্ন পত্রিকার লেখা রিপ্রিন্ট করা, যাতে বেশি থেকে বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছোয়। তাতে লেখকের ওপর গুচ্ছের লেখার চাপ থাকবে না। হুদো- হুদো লেখার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে কবি কিম্বা গল্প লেখকরা উচিত সময় পাচ্ছেন না। আর সাংস্কৃতিক রাজনীতি এমন অবস্থায় রয়েছে — পোস্টমডার্ন অবশ্যই — যে অনেকে অনুরোধ ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না। পাশাপাশি ঘটছে মিডিয়া ক্লোনদের কারবার।

অরূপ: এক্সট্রিম ফর্ম অব পোস্টমডার্নিজম কি একান্ত বর্জনীয় বা অসম্ভব ? কেননা হাবেরমাসের মতে পোস্টমডার্নিজম যদি মডার্নিজমকে পকেটস্থ করে চলে তবেই একটা পোস্টমডার্ন সিনথেসিসের রূপ আমরা পেতে পারি। ইহাব হাসানও বলেছেন "দ্য টার্ম পোস্টমডার্নিজম ইজ নট ওনলি অকওয়ার্ড; ইট ইজ অলসো ঈডিপাল, অ্যান্ড লাইক আ রিবেলিয়াস বাট ইমপোটেন্ট অ্যাডলেসেন্ট, ইট ক্যান নট সেপারেট ইটসেলফ কমপ্লিটলি ফ্রম ইটস পেরেন্ট।" আপনার কী বক্তব্য ?

মলয় : পোস্টমডার্নিজম শব্দটা আমিও প্রথম দিকে ব্যবহার করে ফেলেছি। কিন্তু এটা যখন তত্ত্বই নয়, তখন আবার *ইজম* কিসের ? গ্রেকোরোমার ঐতিহ্য হল ইজম- আদেখলা। যেহেতু *ইজম* নয়, তাই ভাবুকদের ভাবনাও পাল্টাতে থেকেছে। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ইহাব হাসান বলেছেন যে *শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়* পোস্টমডার্নের সমস্ত বৈশিষ্ট্য আছে। আর ওদের এক্সট্রিম পোস্টমডার্ন তুমি পাবে না আমাদের সমাজে। ওদের দেশে কাগজে পোঁদ পোঁছা নর্মাল, কিন্তু আমাদের সমাজে অ্যাবনর্মাল। আমাদের এখানে সুখরাম, লালু যাদব, জয়ললিতাদের হেসে খেলে নেতাগিরি নর্মাল। ওদের ওখানে ঘানি ঘোরাতে হত। আমাদের এখানে এফ সি আই গুদামে চাল- গম পচে অথচ লোকে না খেতে পেয়ে মরে। একটু আগেই আমি বলেছিলুম যে হাবেরমাসদের পড়ো, কিন্তু বই থেকে বেরিয়ে নিজের চারপাশটা খুঁটিয়ে দ্যাখো।

দীপঙ্কর: *দি মেটাফিজিক্স অব ভার্চুয়াল রিয়্যালিটির* লেখক মাইকেল হেইম বলেছেন, "লাইব্রেরিজ মে বি দ্য লাস্ট আউটপোস্টস অব প্রিডিজিটাল ইনটিউয়িশন।" আপনি কি কবিতাকে এখনকার এই বাজারু প্রিন্টফর্মেই দেখতে আগ্রহী ? এমটিভিতে দ্যাখেন নিশ্চয়ই নাচ-গান ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রেজেন্টেশনে কতটা বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে ! আপনি কি চান না আপনার কবিতা তার হাইপাররিয়্যাল আবহ হাইপারটেক্সট সমেত কম্পিউটারের পেশকশে আরও সুররিয়্যাল হয়ে উঠুক ?

মলয় : আরে ওসব ওদের দেশের ব্যাপার স্যাপার। আমাদের এখানে তো বাঙালি নব্য সাম্রাজ্যবাদীরা তিন দশক কমপিউটার ঢুকতে দেয়নি পশ্চিমবঙ্গে। আজ অব্দি একটাও সুররিয়্যাল ফিল্ম হলো না। অনেক ওয়েব সাইট তো ফ্রি পাওয়া যায়। তোমরা নিজেদের কবিতা নিয়ে একটা প্রয়াস করে দেখাও দিকিনি। ভিডিও তুলে ঢুকিয়ে দাও।

অরূপ : লিওতার তাঁর মোস্টপপুলার বই *দি পোস্টমডার্ন কন্ডিশনকে* পরবর্তীকালে 'দি ওয়র্স্ট বুক' বলেছিলেন। তা এই জন্য নয় যে লিওতার এই বইয়ের আইডিয়াকে রিজেক্ট করেছিলেন পরবর্তীসময়ে। তা হয়ত এইজন্যে যে বইটি তাঁকে একজন পাতি থিওরিস্ট হিসেবে প্রতিপন্ন করে ছেড়েছিল, যা ছিল লিওতারের চূড়ান্ত অপছন্দের। আপনি পোস্টমডার্নকে কতটা থিওরি হিসেবে মানেন ?

মলয় : থিওরি নয় বলেই একে বলা হচ্ছে পোস্টমডার্ন। নয়তো মডার্নের অন্তর্গত কোনো ইজম হত। লিওতার যখন ফেদেরিকো দ্য ওনিসের ধারণাটা নিয়েছিলেন, তখন কন্ডিশনের কথা বলেছিলেন। ইউরোপের কলেজের মাস্টাররা করে খাবার ধান্দায় অবস্থাটাকেই তত্ত্ব বানিয়ে ছাড়লে। আমাদের দেশের কপিল মুনি প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহংকার, সূক্ষ্মপঞ্চভূত, স্থূলপঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পুরুষ ইত্যাদি সাংখ্যদর্শনের যে সূত্র দিয়েছিলেন, ইংরেজগুলো এসে তাকে তত্ত্ব বানিয়ে ছেড়েছিল।

দীপঙ্কর : সুকুমার রায় সম্পর্কে আপনাকে কখনও কোনো মন্তব্য করতে দেখিনি। ওনার 'ননসেন্স' রচনাগুলো তো যথেষ্ট রকমের পোস্টমডার্ন ! শিশু সাহিত্য বলে কি ধর্তব্য নয় ? "হলদে সবুজ ওরাং ওটাং/ ইঁট পাটকেল চিৎপটাং/ গন্ধগোকুল হিজিবিজি/ নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি/ নন্দীভৃঙ্গী সারেগামা/ নেই মামা তাই কানামামা/ চিনেবাদাম সর্দিকাশি/ ব্লটিং পেপার বাঘের মাসী/ মুশকিল আসান উড়ে মালি/ ধর্মতলা কর্মখালি।" এতো আপনার সেই অথর্ববেদের ঐতস ঋষির প্রলাপের চেয়েও পলিফনিক, কার্নিভালেস্ক, বহুবাচনিক। হাঁসজারু, টিয়ামুখো গিরগিটি, হাতিমির হাইব্রিডাইজেশান দেখে তো ভিরমি খেতে হয় ! বলুন কিছু ?

মলয় : আই অ্যাগ্রি। আমার লেখায় পাসিং রেফারেন্স আছে বটে, তবে এক্সক্লুসিভলি লিখিনি। ছ- সাতশো পৃষ্ঠা অগ্রন্থিত গদ্য জমে গেছে। দেখি যদি সময় পাই আর তোমার দেওয়া ফিজিওথেরাপির ইন্সট্রুমেন্টে যদি আঙুলগুলোর উৎসাহ ফিরে আসে।

অরূপ : ইম্যানুয়েল কান্টের *আলোকপ্রাপ্তি কী* বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি বলেছিলেন, "মহামতি কান্ট আলোকপ্রাপ্তিকে বলেছিলেন পরিবর্তন, যুক্তিবাদিতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তি। তখন থেকে পাই শিল্পীর স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক উদারনীতির বিতর্কসঞ্চারী মর্যাদা। স্বাধীনতা থেকে ক্ষমতা, বাদবিচারের ক্ষমতা।" এখন আমার প্রশ্ন এটাই যে, পোস্টমডার্ন কবি- ঔপন্যাসিকের ভাবনাচিন্তাতেও যখন এই সব বিন্দুগুলো টের পাওয়া যায়, তখন নতুন প্রসঙ্গ তারা কী আনলেন ? নাকি শিল্পীর স্বাধীনতার ব্যাপারে অন্যান্য যুগের মত কান্টযুগের অ্যাবসলিউট ট্রুথকে আবার নতুন সময়ের প্রেক্ষায় যাচাই করে নেবার প্রয়োজনেই তাঁরা কলম ধরলেন ? ব্যাপারটায় একটু আলো ফেলুন।

মলয় : কান্টের ভাবনা খৃষ্টধর্মী। আলোকপ্রাপ্তি ব্যাপারটা পরিশীলিত খৃষ্টধর্ম। অ্যাবসলিউট ট্রুথ ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর লাটসায়েবকে লিখেছিলেন যে *ট্রুথ কুড বি ডাবল* । এখন আমরা জানি ট্রুথ ইজ ম্যানুফ্যাকচার্ড বাই পাওয়ার্স দ্যাট বি। যুক্তিবাদিতাকে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করেছে তৃতীয় তরঙ্গের বিজ্ঞান- ভাবনা। ব্যক্তিস্বাধীনতা জিনিসটা যে গ্যাঁড়াকল, তা নিজের অবস্থা খতিয়ে দেখলেই টের পাবে। ইংরেজরা আসার পর আর্ট শব্দটা যখন এল, তখন রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা করলেন শিল্প। যে লোক তার কাজে সময়কে *টাইমলেস* করতে পারে, সে- ই শিল্পী খেতাব পায়। কিছুই টাইমলেস নয়, কেননা ভাষা — সমস্ত অর্থে — বদলায়। আমাদের এখানে তো বাজারু শিল্পীরা এত ভীতু যে গ্রহরত্নের আংটি পরে, অ্যাকাডেমিতে গিয়ে তেল মারে। আর আমাদের দেশী দেবতার মুন্ডু কেটে নিয়ে গিয়ে আমেরিকার কালো বাজারে তা শিল্প হিসেবে বিকোয়। আলোকপ্রাপ্ত মানে বুশ, অন্ধকার প্রাপ্ত মানে ওসামা। এই দাঁড়িয়েছে ক্ষমতার প্যায়দা করা সত্য। আর কান্টযুগ নামে এদেশে কিছু হতে পারে না। সাহিত্যে আছে চর্যাপদের যুগ, পদাবলীর যুগ, মঙ্গল কাব্যের যুগ। পুরাণে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি।

দীপঙ্কর : আপনি কোথায় যেন বলেছেন যে পোস্টমডার্ন ভাবনা হয়, সাহিত্য হয়, কবিতা হয়, কিন্তু পোস্টমডার্ন কবি বলে কিছু হয় না। তার মানে ব্যক্তিবিশেষের আলোচনা প্রসঙ্গে, বা ধরুন আমার বা অরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে, পোস্টমডার্নিজম কি অ্যাপলিকেবল নয় ? ম্যাডোনাকে আপনি কি বলবেন ? *নিউইয়র্ক পোস্ট*- এর সাংবাদিক রে কেরিসন তাঁর সম্পর্কে এক জায়গায় বলছেন, "শি উইল ডু এনিথিং, সে এনিথিং, উইয়ার এনিথিং, মক এনিথিং, ডিগ্রেড এনিথিং টু ড্র অ্যাটেনশন টু হারসেলফ অ্যান্ড মেক আ বাক্। শি ইজ কুইনটিসেনশল সিম্বল অব দ্য এজ; সেল্ফ ইনডালজেন্ট, স্যাক্রিলেজিয়াস, শেমলেস, হলো।" গ্রাহাম ক্রে বলেছেন, "ম্যাডোনা ইজ পারহ্যাপ্স দি মোস্ট ভিজিবল এগজাম্পল অব হোয়াট ইজ কল্ড পোস্টমডার্নিজম।" আবার এই ম্যাডোনা এক সাক্ষাৎকারে বলছেন যে তিনি এত ভিড় এত খ্যাতি- প্রতিপত্তির ভেতরেও লস অব আইডেনটিটির বিমারিতে ভুগছেন ! অথচ দেখুন তিনি কখনো ড্রাগস নেননি, ড্রিংক করেন না, প্রতিদিন পাঁচ মাইল জগিং করেন, ডায়েটের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। আজকাল আবার স্পিরিচুয়ালিজমে বিভোর হয়ে পড়েছেন। আরেক প্রিয় পোস্টমডার্ন নারী চরিত্র ক্যাথি অ্যাংকর আবার ছিলেন নিজের সম্পর্কে উদাসীন, রুথলেস। ক্যান্সারে যখন ভুগছেন, চিকিৎসাও করাতে চাননি, ওষুধ খেতে চাননি, ডাক্তারদের টেনে খিস্তি মেরেছেন। এই দুই নারী চরিত্র আপনার কতটা ফেভারিট ? আপনার ছেলে জিতেন্দ্রিয়কে *ব্লাড অ্যান্ড গাটস্ ইন হাই স্কুল* বইটা পড়তে দেখলে তা কি হাত থেকে ছিনিয়ে নেবেন ? বাড়ি মাথায় করবেন চিল্লিয়ে ?

মলয় : তোমরা এত বিদেশীদের দ্বারা অভিভূত কেন তখন থেকে বুঝতে পারছি না। ইন্টারনেটে চিপকে থাক বলে ? নাকি দিল্লীতে থাক বলে ? ম্যাডনার বদলে লালু যাদবের কথা বলতে পারতে। ক্যাথি অ্যাংকরের বদলে ফালগুনি রায়ের কথা বলতে পারতে। ম্যাডনা তো বুডঢি। তার চেয়ে শাকিরাকে দ্যাখো। ইশা কপিকর কে দ্যাখো। ফ্যাশন টিভিতে লাতিন আমেরিকার কার্নিভাল দ্যাখো, সুষমা স্বরাজ চ্যানেলটা ব্যান করে দেবার আগে। আমার ছেলে তো গত বছর *বেস্ট ডার্টি জোকস* বইটা দিয়ে গেছে। বাংলায় এরকম বই বিকোলে তো কলকেতিয়া নব্য সাম্রাজ্যবাদীরা হাড্ডি পিলপিলিয়ে দেবে। আরেকটা প্রশ্ন তুমি তুলেছ সেটা কৌম নিরপেক্ষ ব্যক্তিসৃজন ও ব্যক্তিনির্মাণ সম্পর্কিত। ব্যক্তি ও ব্যক্তির কাজকে একই করে ফেলার ধারণাটা গ্রেকোরোমান অধিবিদ্যাগত মনণবিশ্বের ফসল। ওরাই এনেছিল প্রজ্ঞাকে কৌমনিরপেক্ষ ব্যক্তি লক্ষণের ধারণা হিসেবে ভাবতে। ব্যক্তি মালিকানার ভাবকল্প ওরা এনেছিল। লেখার সাবজেকটিভিটির অস্তিত্বটা ওদের মগজপ্রসূত। *মহাভারতে* বেদব্যাসের প্রতিস্ব খোঁজা হয় না, বা কালিদাসের প্রতিস্ব খোঁজা হয় না *মেঘদূতে* । ব্যক্তি প্রতিস্বের প্রকল্পটা মডার্নিজমের। পোস্টমডার্ন সাবজেকটিভিটি তো একক নয়, নিরেট- নিশ্চল নয়। তাই কবিতার মধ্যে লেখকটাকে খোঁজা আজগুবি। লেখক অনাধুনিক বা আধুনিক বা অধুনান্তিক কবিতা একই সঙ্গে লিখতে পারেন। ম্যাডনা নিজেকে একটা মিউজিকাল প্রডাক্ট করে ফেলেছে যেমন লালু যাদব নিজেকে করেছে পলিটিকাল প্রোডাক্ট। ওরা নিজেদের বেচে। তোমার প্রতিস্ব তো বহুমাত্রিক। তাই কোনও একটা মাত্রা দিয়ে চিহ্নিত করাটা গোলমেলে। টেক্সটটাই আলোচ্য। লেখকটা নয়।

অরূপ : পোস্টমডার্ন ভাবনা অনুযায়ী রিলেটিভিজম সর্বজন স্বীকৃত। যেমন ধরুন প্লুরালিজম। এক্সট্রিম ফর্ম অব প্লুরালিজম, যেখানে আমরা অ্যাবসলিউট ট্রুথ এবং মেটান্যারেটিভসকে নাকচ করেই ভাবতে চাইছি, আমরা তার ফলে এক রকম অদ্ভুত অসহায়তা বোধ করছি বলে মনে হয় না কি? কেননা আমাদের অস্তিত্বকে এই অবস্থায়, এই উত্তরঔপনিবেশিক পোস্টমডার্ন কন্ডিশনেও, ঘিরে থাকছে বহুচর্চিত বুদ্ধি-বিভাষা, ঐতিহাসিক দর্শনের উত্তরাধিকার। এখন প্রশ্ন হল, আমাদের ভবিষ্যত ভাবনাচিন্তা, আচরণ, কার্যকলাপ, কতটা সেই উত্তরাধিকার-বিরোধী চারিত্র্য পেয়ে বসবে ?

মলয় : ভারতীয় সভ্যতা তো কয়েক হাজার বছরের। মুনি- ঋষি- বেদজ্ঞ- বৈয়াকরণিক কেউ তো কোন মেটান্যারেটিভ ছকে যাননি। তাঁরা যখন শিবকে বললেন সত্য, তখন তাঁরা জেনে গিয়েছিলেন অ্যাবসলিউট ট্রুথ ব্যাপারটা অ্যাবসার্ড। শিব ধারণাটাই বহুত্বময়। যখন তা লিঙ্গের পরিসরে পূজ্য হল, নানা রঙের পাথর ছাড়াও নানারকম ধাতু, কাঠ, বালি, বরফের ফর্মে তার বহুত্ব বজায় রাখা হল। তা যে কেউ দিতে পারত। অ্যাবসলিউট ট্রুথ আর মেটান্যারেটিভের উৎস হল *ওল্ড টেস্টামেন্ট* - এর মোনোসেন্ট্রিক ভাবভিত্তি। আমাদের দেশটা তো প্লুরালিজমের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কতো দেশ থেকে কতো আক্রমণকারীরা ঢুকেছে আর মিশে গেছে। জাত, ধর্ম, বর্ণ, পেশা, বিশ্বাস, আচার-বিচার, সংস্কৃতির বৈভিন্ন সত্ত্বেও গোলমাল হয়নি। গোল বাধল মোনোসেন্ট্রিজমের জন্যে, যা এনেছিল ইউরোপীয়রা। জিন্না আর নেহেরু দুজনেই ছিলেন ইউরোপীয়ান মোনোসেন্ট্রিক। বিজেপি যাকে হিন্দুত্ব বলে চালাচ্ছে তাও মোনোসেন্ট্রিজম। প্লুরালিস্ট জনসমাজে মোনোসেন্ট্রিজম চাপালে তাতে চিড় ধরতে থাকবে। সোভিয়েট দেশে তা- ই হয়েছিল। তোমার যাকে এক্সট্রিম ফর্ম অব প্লুরালিজম মনে হচ্ছে, তা মোনোসেন্ট্রিজমের চেহারা। বৈভিন্ন ব্যাপারটা প্রাকৃতিক, ভৌগলিক। তা থাকবেই। তাকে নাকচ করতে চায় মোনোসেন্ট্রিজম। ফলে হ্যাঙ্গাম হয়। যে হ্যাঙ্গাম হিটলার, স্তালিন, পলপট, পিনোশে, মোল্লা ওমর, ইদি আমিনের আমলে হয়েছিল। বহুত্ব আর বৈভিন্ন প্রকৃতির দর্শন। মোনোসেন্ট্রিজম তাতে হস্তক্ষেপ করে ইতিহাসের দর্শন বানায়। প্রতিটি ঐতিহাসিক নিজের পছন্দমতন তথ্য বাছেন আর ইতিহাসের দর্শন বানান। সমাজ চলে লক্ষ লক্ষ মানুষের টানাপোড়েনে। বুদ্ধিজীবীর আর ঐতিহাসিক দর্শনে নয়। যাবতীয় তত্ত্ব তাতে ঘুলটে যায়। পোস্টমডার্নকে তাই বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল ইউনিফায়ার, যার পরিসরে বৈভিন্নগুলো স্বীকৃত। মোনোসেন্ট্রিক খাঁচাটা যদি ঘিরে ধরে, অর্থাৎ মডার্নের ইন্টারনাল ইউনিফায়ার, দিল্লীতে থাকার দরুণ হয়ত অমন খাঁচা চারপাশে গজায়, তাহলে অসহায়তা বোধ গজাতে পারে। উত্তরাধিকারটা মাইক্রোলেভেলের। তাকে ম্যাক্রোলেভেলে *আমাদের* বলে জেনারালাইজ করা যায় না। কলকাতার মিডিয়া আর মধ্যবর্গ পত্রিকায় তোমরা যে অবহেলিত তা তোমাদের মাইক্রোলেভেল বৈভিন্নতার কারণে তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। যে হিন্দি ভাষী কবিরা হাওয়া ৪৯- এর *পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতায়ে* - র সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের তোমাদের কবিতা তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তাঁরা বলছেন যে, অতিপ্রকাশিত যাঁদের অনুবাদ তাঁরা পড়তেন, তাঁদের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, বাংলা কবিতা বুঝি কানাগলিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর কলকেতিয়া মিডিয়ার কমিনাপন্ নিয়ে কীই বা বলি। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়- এর অ্যাকাডেমি পুরষ্কারের খবরটা এমনভাবে ব্ল্যাক- আউট করা হলো যে, যারা অ্যাদ্দিন প্রতিষ্ঠান বলে কিছু নেই হেঁকে আসছিল, সে সব মদনা- সাধনাদের চোদ্দপুরুষের পোঁদে বিরাশি ছাক্কার ক্যাঁৎকা পড়েছে। ছক্কা

বলছি না, ছাক্কা, ছাক্কা। সন্দীপনের পুরষ্কার না নেবার হামবড়াই শেষমেষ ছাক্কাদের, "তাইয়ব অল্লি প্যায়ার কা দুশমন হায়- হায়", হাততালি আক্রান্ত।

(উৎস : জিরো আওয়ার, সংখ্যা ৩৪, কলকাতা বইমেলা, ২০০৩)

কথোপচারণ

স্বপন রায়ের সঙ্গে খাস বাতচিত করেছেন মৌলিনাথ বিশ্বাস

মৌলিনাথ বিশ্বাস : তোমাদের লেখালেখি গড়ে ৩০ বছর হল। অভিনন্দন। এই ৩০ বছর পেরিয়ে এসে শুরুর দিন গুলোর দিকে তাকালে কী মনে হয়?

স্বপন রায় : মনে হয় যে বাংলা কবিতা লেখার জন্য আমি বা আমরা কবিতাকে নতুন করার কথা ভেবেছিলাম, আর সেই ভাবনাটা পিওর ছিল, পিওর এই অর্থে যে আমরা কবিতা ছাড়া অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিইনি, আঘাত করিনি কাউকে, উচ্চকিত ঘোষণা করিনি, শুধু নতুন কবিতা'র অভিযানে মেতে থেকেছি আর এর ফলে একটি বা দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের সঙ্গে যাদের পথ বা ভাবনা মেলেনি তাদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রয়ে গেছে! এটা খুব বড় কথা, একটি নতুন ভাবনার কবিতাধারায় লিখতে থাকা কবিদের সঙ্গে আগের দশকগুলিতে গোষ্ঠীগত ভাবে এবং নিজেদের অভ্যন্তরেও নানারকম গোলামাল, এমনকি মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হতে দেখেছি বা শুনেছি, আমাদের সময়ে

এটা সাধারণভাবে হয়নি, এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ!

মৌলিনাথ : তোমরা বেশিরভাগ জন- ই প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তটাকে এড়িয়ে গিয়েছ, এটা কি তোমরা সচেতন ভাবে আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলে না ঘটনাচক্র?

স্বপন : আমি তো প্রথমদিকে লিখেছি, পরে যখন মনে হল যে যদি লিখি নিজের লেখাই লিখবো এবং ওই ভাবনাতেই যখন বাঁচতে শুরু করলাম আমার কাছে এ সব গুরুত্বহীন হয়ে গেল! আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমি যে লেখায় চলে এসেছি সে সব লেখার অবস্থানটা খুব এক্সট্রিম, হয় আমি নতুনধারার কবিতা লেখার নামে কবিতাকেই ধ্বংস করছি আর নইলে এমন লেখার পরিসরে ঢুকে গিয়েছি যা নেওয়ার ক্ষমতা তথাকথিত বানিজ্যিক পত্রিকার নেই! কবিতা থেকে বিষয়কে দূরে সরিয়ে, কাব্যপ্রতিমা'কে অস্বীকার করে শৃঙ্খলাহীন কবিতায় আমি, তুমি, মত বা অনেক সময় ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে, চেতনার বহির্গামী ড্রাইভ'কে সম্বল করে যে নতুন কবিতাভাষার খোঁজে আমি বা আমরা ছিলাম তার সঙ্গে তখনকার পদ্যময় ভাবালুতার বিস্তর ফারাক ছিল! এমনকি ফারাক ছিল সমসাময়িক বন্ধু কবিদের লেখার সঙ্গেও! *কবিতা ক্যাম্পাস'* কে কেন্দ্র করে যে পরিসর ওই সময় গড়ে উঠছিল তা ভাবনাগত ভাবে, প্রকাশের আধার এবং আধেয়গত ভাবে এবং অভিযানের রোমাঞ্চজনিত কারণে তরুণ কবিদের আকৃষ্ট করেছিল এবং অগ্রজ কবিরা হয় এর বিরোধীতা করেছিলেন নইলে চুপ করে থেকেছিলেন, ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল, যেমন অব্যয় পত্রিকার শ্যামল দা (অতীন্দ্রিয় পাঠক), প্রয়াত কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, অনেক পরে সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরীও আগ্রহ দেখিয়েছিলেন!

তবে অগ্রজদের এমন ব্যবহার আমাদের আহত করেনি! বাংলা কবিতা তখন মতাবাদিক গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে রয়েছে! বামপন্থী (নানা রঙের) আর প্রাতিষ্ঠানিক শিবির! মজার কথা ছিল এঁদের কবিতা'র বিষয়গত ফারাক থাকলেও, কবিতা প্রকাশের ভাষা এবং আঙ্গিক একইরকমের ছিল, কয়েকটা প্রতিষ্ঠিত প্যাটার্নের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল এঁদের কবিতা, এই ধারাতেই কিন্তু বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি রচিত হয়েছে, আর আমরা ঠিক করেছিলাম এই বহুব্যবহৃত ভাষায় বহুব্যবহৃত বিষয়ের কবিতা আর লিখবো না! আবার আমাদের কিছু বন্ধুদের সোচ্চার "প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা" এবং তজ্জনিত যাবতীয় ক্রোধ একটি বহুল প্রচারিত কাগজের বিরুদ্ধে অহরহ প্রকাশ করাও আমার বা আমাদের প্রেফারেন্স ছিল না! কারণ প্রতিষ্ঠিত কবিতাভাষাকে যদি পাল্টাতেই হয় সাময়িক তর্জন গর্জন দিয়ে তা হবেনা, এমনটাই আমরা ভেবেছিলাম ওই শুরুর সময়ে! হতে পারে ভাবনাগত সাযুজ্যের ফলেই তখনকার *কবিতা ক্যাম্পাসে'*র ভেতরে আমরা কয়েকজন কাছাকাছি এসেছিলাম! আমরা মানে, আমি, রঞ্জন মৈত্র, ধীমান চক্রবর্তী, প্রণব পাল, অলোক বিশ্বাস! বারীন দা (কবি বারীন ঘোষাল) ছিল ক্যাটালিস্ট, প্রচুর তর্ক-বিতর্ক, অনুসন্ধান, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব- কবিতার মূল্যায়ন এ সবই হতো বেশ কয়েকবছর ধরে চলা কবিতা'র ওয়ার্কশপে, এখানেই আমাদের মনে হতে থাকে যে বাংলা মূলধারা সুর- রিয়াল ভাবনা এবং জীবনানন্দে জেনে বা না জেনে আচ্ছন্ন হয়ে আছে! এই

ওয়ার্কশপেই ‘নির্মিত কবিতা’র কথা ভাবা হয়। সে সময়ে জ্যাক দেরিদা’র ডিকন্সট্রাকশন নিয়ে এমনকি সোচ্চার প্রতিষ্ঠান বিরোধীরাও সোচ্চার ছিলনা! "কবিতা" কবি খুঁজে বের করে লিপিবদ্ধ করে, কবিতা যেহেতু হয়ে থাকে সবকিছুতেই, তাই কবি যখনই তাকে লেখায় তুলে আনে ডিকন্সট্রাকশান শুরু হয়ে যায়! এই ভাবনা উস্কে দিয়েছেলেন বারীন দা, কবি বারীন ঘোষাল! ইতিমধ্যে আমি, ধীমান, প্রণব, রঞ্জন, অলোক ধীরে ধীরে আলঙ্কারিক স্থা–বিরোধীতা’র জায়গা থেকে সরে এসে কবিতা ভাষার অভ্যন্তরে চেতনাভিযানের স্থা- বিরোধ জনিত একটা সাযুজ্যে চলে এসেছি! এই আবহ *কবিতা ক্যাম্পাস* কে নতুন ধারার কবিতা লেখার বিশ্বস্ত পরিসর হিসেবেও তুলে ধরেছিল! যেহেতু “নতুন কবিতা” একটি চেতনা- নির্ভর ভাবনাপ্রধান পদক্ষেপ মাত্র ছিল, সেহেতু তাকে মেনিফেস্টো’র সীমায় আটকে রাখা যায়নি, বারীন দা ভাবিত “অতিচেতনা” ছিল কেন্দ্রছাড়া চেতনার ড্রাইভ, যা বহু পুরনো কিন্তু বাংলা কবিতায় রীতিমত সজীব স্বয়ংক্রিয় পরাবাস্তবতার বিপরীত ছিল, বাংলা কবিতা যে চর্বিতচর্বণে বিধিবদ্ধ এবং যান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল আমরা নিজেদের কবিতাভাষা তৈরি করে তার থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম, এটা অনেকের কাছে যদিও আজো আত্মহত্যা ব’লে মনে হয়! এর ফলে আমরা মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম এটা যেমন ঠিক, অন্যদিকে অভিযানপ্রিয় তরুণ প্রজন্মের কাছে ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যও হয়ে উঠছিলাম!

আদর্শ ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার, কবিতা ভাবনাগত অভিপ্রায়! এখন মনে হয় ওইসময় নিজের কবিতাভাষা খোঁজার অভিযানে আমরা এতটাই মশগুল ছিলাম যে প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অবান্তর হয়ে গিয়েছিল, আমাদের সমসাময়িক অনেক কবিই কিন্তু তখন প্রাতিষ্ঠানিক কাগজে লেখালিখি করছে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পি.আর ইত্যাদি করে যাচ্ছে, এ নিয়ে আমাদের কোন অসূয়া ছিল না, প্রতিক্রিয়াও ছিল না! একটা পুরনো ধারায় লেখালিখি করা আর একটা নতুন ধারার লেখালিখির জন্য সৃষ্টিশীল থাকার মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য এটাই বোধহয় আমাদের পুরনো কবিতা’র কাগজ/ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, প্রতিষ্ঠান তো এর ভেতরেই পড়ে!

মৌলিনাথ : এর ফলে তোমরা জনপ্রিয়তা কে এড়াতে পেরেছিলে। যার জন্য তোমরা নিজেদের মতো ক’রে লিখতে পেরেছো, অন্তত যারা চেয়েছিলে। আমি এলোমেলো কয়েকটা নাম করছি- তুমি, রঞ্জন, রতন, ধীমান, ঈশিতা, চিত্তরঞ্জন, নাসের, প্রণব, অলোক, শুভংকর, সুতপা, হাসমত জালাল, শ্রীধর, শুভব্রত, রামকিশোর, জয়দেব ও আরো অনেকে। তুমি কি সহমত?

স্বপন : জনপ্রিয়তা নেতাদের ক্ষেত্র ছাড়াও বিনোদন ইত্যাদিতে যতটা লাগসই, কবিতায় বোধহয় ততটা নয়! কবি জনপ্রিয় হতেই পারেন, তবে সেক্ষেত্রে তাঁকে কবিতা বহির্ভূত নানারকমের মিথের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে হয়, এমনকি মৃত্যুর পরেও শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচিত হন না! তবে আমি মনে করি, যে কবি মূলধারাকে অস্বীকার করে নিজস্বঃ কবিতা’র খোঁজে বেরিয়ে পড়বে, সে একা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে প্রথমে বা হয়তো সারাজীবনই! সেই একাকী খোঁজের রাস্তায় তার জন্য কোন হাততালি বরাদ্দ থাকেনা! তবে এই রাস্তায় কিন্তু অমন একাকী খুঁজিয়েও কিছু থাকে, তারা পরস্পরের দিকে আকর্ষিত হয়, বন্ধুত্ব হয়, কবিতা উদযাপিত হয় তারপর! একটা কথা

বলতেই হয় এখানে যে প্রথমদিকের *কবিতা ক্যাম্পাসে*'র ভেতরে নানারকমের ভাবনাগত স্ববিরোধীতা ছিল! এর ফলে একধরণের ফিল্টার প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায় পত্রিকার কুশীলবদের মধ্যে! খুবই স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়া ছিল এটি, এই প্রক্রিয়াতেই রতন, আমি, ধীমান, রঞ্জন, প্রণব, অলোক বেশ কয়েকটি বছর *কবিতা ক্যাম্পাসে* আবদ্ধ ছিলাম! শুভঙ্কর দাশ তার নিজের বিশ্বাসের ভিত্তিতে আজো সক্রিয় রয়েছে। *কবিতা ক্যাম্পাসে*'র প্রথম দিকেই ও ওর নিজস্ব কাগজ এবং প্রকাশনী গড়ে তোলে, আমাদের পারস্পরিক ভাবনায় বিরোধ থাকলেও আমি ওর স্পিরিট এবং পান্ডিত্য'কে শ্রদ্ধা করি! নাসের অত্যন্ত সজ্জন কবি, সুভদ্র এই কবি পরে *কবিতা পাক্ষিকে*'র অন্যতম কান্ডারি হিসেবে পরিচিত হয়েছে। হাসমত জালালের সঙ্গে আমার কবিতা নিয়ে তেমন যোগাযোগ না থাকলেও হাসমতের মধুর ব্যক্তিত্ব প্রথম থেকেই ওকে সবার প্রিয় করে তুলেছিল! ও এখনো রীতিমত সক্রিয় এবং আমার খুব ভাল বন্ধুও বটে! রামকিশোর আমার সহযাত্রী বন্ধু, *কবিতা ক্যাম্পাসে*'র প্রথম দিনগুলো ওকে ছাড়া ভাবাই যায়না! সুতপা বা শুভব্রত'র সঙ্গে আমার সেরকম কোন যোগাযোগ নেই! তবে শুভব্রতকে চিনি, ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সম্পাদক এবং দক্ষ কবি। সুতপা'র কবিতা পড়েছি, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, আমাদের সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি সুতপা! আমার বন্ধু ঈশিতা'ও (কবি ঈশিতা ভাদুড়ি) তাই। শ্রীধর'কে খুব মিস করি, নানারকম কান্ডকারখানা করে ও কোথায় আছে আমি জানিনা! যেখানেই থাকুক ভাল থাকুক! জয়দেবের সঙ্গেও আমার খুব একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। কিন্তু ওর অকালপ্রয়ান মেনে নিতে পারিনি! যেভাবে মেনে নিতে পারিনি রতনের মৃত্যুকেও!

ধীমান *কবিতা ক্যাম্পাস* ছেড়ে যাওয়ার পরে আরেকটি পরিসর */ভিন্নমুখ* পত্রিকার মাধ্যমে অন্যান্যদের সঙ্গে গড়ে তুলেছিল! একটা কাগজ ছেড়ে দেওয়ার পেছনে কারণ তো থাকেই। তবে সেই কাগজ ছেড়ে যাওয়া ব্যক্তি যদি পুরনো কবিতা'কে আশ্রয় করে গতানুগতিক লেখা লিখতে শুরু করে তখন সন্দেহ হয়! ধীমান এটা করেনি, ও নতুন ধারার লেখালিখি'র অন্য পরিসর গড়ে তুলেছিল */ভিন্নমুখ* পত্রিকার মাধ্যমে! চিত্তরঞ্জন হীরা, আশিস সান্যাল, ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, কল্যানী লাহিড়ি, প্রদীপ চক্রবর্তী'র মত শক্তিশালী কবি এই কাগজটিকে চরম উচ্চতায় নিয়ে গেছে! নতুন শতকের প্রথম দিকেই আমি এবং রঞ্জন "নতুন কবিতা" পত্রিকা শুরু করি। যা এখনো চলছে। এই পত্রিকা অবশ্যই সক্রিয় থাকতো না, যদি না বিভিন্ন সময়ে ইন্দ্রনীল ঘোষ, অরূপরতন ঘোষ, তপোন দাশ, সব্যসাচী হাজরা এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সৌমিত্র সেনগুপ্ত'র সক্রিয় সহযোগিতা থাকতো! এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে থেকেছে সহযাত্রীর মত! এ ছাড়াও নতুনধারায় আগ্রহী তরুণ কবিদের "মিটিং পয়েন্ট" হয়ে উঠেছে *নতুন কবিতা,* বইমেলার স্টলে আসলেই তা বোঝা যায়! প্রণব পালও এখন *কবিতা ক্যাম্পাসে* নেই, অলোক পত্রিকাটিকে সাফল্যের সঙ্গে চালাক এই কামনা করি!

জনপ্রিয় কবি এবং কবিতা যেমন আছে, তেমনই পুরনো কবিতা আর নতুন কবিতা'র বিভাজিত পাঠকও রয়েছে! নিসন্দেহে পুরনো কবিতা যা জনপ্রিয়ও বটে হেডকাউন্টে অনেক এগিয়ে, অন্যদিকে সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা কবিতায় যারা সক্রিয় তাদের একটা প্রভাব থাকে চোরাস্রোতের, মিডিয়ার সাধ্য কি তাকে আটকায়! আজ আমি, ধীমান, প্রণব, রঞ্জন যে এতদিন পরেও একসঙ্গে ঘুরতে, আড্ডা মারতে

ভালোবাসি, আমাদের বন্ধুত্ব'কে উদযাপিত করি এটা তো সেই ৯০ দশকের আগে আমরা ভাবিনি, এটা সম্ভব হয়েছে পারস্পরিক সম্মানবোধের জন্য, যা সাময়িক মালিন্য কে মন থেকে অনায়াসে মুছে দিয়েছে! হয়তো স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া চোরাস্রোতেই আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি!

মৌলিনাথ : তোমাদের কবিতার মধ্যে এই কারণে একটা বৈচিত্র্য আছে। তোমার সঙ্গে প্রবাল বসু, সুমিতাভ ঘোষাল এর সঙ্গে জহর সেন মজুমদার, মল্লিকা সেনগুপ্তর সঙ্গে সৌমিত বসুর, ধীমান চক্রবর্তীর সঙ্গে চৈতালী চট্টোপাধ্যায় এর লেখায় কোনোই মিল নেই বলা চলে। ধরণ চলন সব আলাদা। তুমি কি বলবে?

স্বপন : আমরা কবিতা লেখা আর কবিতা'র ভাবনাকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি কেন জানিনা! এটা আগে পরিষ্কার হয়ে যাক যে ঠিক হোক বা ভুল, *নতুন কবিতা* কোন মেনিফেস্টো ভিত্তিক আন্দোলন ছিল না! এমনকি কোন সময়শাসিত ভাবনাও ছিল না! মেনিফেস্টো কবিদের আক্রমণাত্মক ক'রে তোলে, দেখা গেছে মেনিফেস্টো সমর্থক এবং বিরোধীদের মধ্যে প্রায়শই তুমুল কলহ, কুৎসা রটনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়ে থাকে! এমনকি তাদের অভ্যন্তরের যে কোন বিবাদও একই পর্যায়ে চলে যায়! অন্যদিকে আধুনিক, উত্তরাধুনিক, অধুনান্তিক ইত্যাদি সময়শাসিত ভাবনায় সৃজনশীলতা ব্যাকসিটে চলে যায়! বিশেষত আমাদের মত দেশে যেখানে এই ভাবনাগুলো থার্ড বা ফোরথ হ্যাণ্ড হয়ে মলিন অবস্থায় অনুপ্রবেশ করে! *নতুন কবিতা* এক কেন্দ্র ছাড়া কবিতা'র অভিযান, ফলে তাকে হতচ্ছাড়া হতেই হয়েছিল! পুরনো, প্রতিষ্ঠিত কবিতা লিখবো না ভাবনার এই অনির্দিষ্ট প্রাথমিকতাই বোধহয় ধারাকবিতা'র বাইরে রঞ্জন, ধীমান, প্রণব, অলোক আর আমাকে কাছকাছি নিয়ে এসেছিল! এই সময়ে বারীন দা'র সঙ্গে আমাদের মিথস্ক্রিয়া ট্রিগার করেছিল আরো বহু পুরনো এবং *নতুন কবিতা*'র পয়েন্টারগুলো! বারীন দা যখন লিখলো, *অতিচেতনা* কবিকে কেন্দ্রচ্যুত করে, কবি এক অজ্ঞান অচেতন অন্ধকারে পা রাখে, সেই পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাটি আলোকিত হয়ে ওঠে, আমরা মেনে নিইনি! সেইসময় এক আবদ্ধ মার্ক্সবাদী চিন্তা ভাবনায় আমরা সবাই কম বেশি প্রভাবিত ছিলাম! *অতিচেতনা* আলো দেখতে বলছিল আর আমরা আগুন জ্বালানো'কে গুরুত্ব দিতাম! যাইহোক তুমুল সেইসব ওয়ার্কশপের দিনগুলোয় কবিতা'র নির্মাণ (বিনির্মাণ পেরোন) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো! শব্দের অর্থ নেই (এটা কোন নতুন ভাবনা নয়) এটা পরিষ্কার হতেই এই অর্থময় কবিতা'র জগতে আমরা আরো একঘরে হতে চাইলাম কাব্যপ্রতিমা'কে অস্বীকার ক'রে! অনুভবের ভাবনাই কবিতা'কে লিপিত করে এই ভাবনায় যখন অজানা অন্ধকারের দিকে যাওয়া চেতনা মিশ্রিত হল, কবিতাও সরে গেল বিষয়, গল্প, নাটক, স্টেটমেন্ট এবং অবশ্যই বাংলা কবিতার সচেয়ে শক্তশালী ধারা পরাবাস্তবতা থেকে! এই প্রক্রিয়াতেই আমরা আলাদা হয়ে গেলাম ধীরে ধীরে প্রবাল, সুমিতাভ, চৈতালী, মল্লিকা, জহর বা সৌমিতের কবিতাশৈলী থেকে! এই আলাদা হওয়াটা কিন্তু ভাবনাগত, এর সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্ক কোন ভাবেই জড়িত ছিলনা! আর যেহেতু *নতুন কবিতা* কোন আন্দোলন ছিলনা সেহেতু কোন 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিস'ও ছিল না! মজার কথা হল যে *নতুন কবিতা*'র যারা কুশীলব তাদের প্রত্যেকের কবিতা এখনো পর্যন্ত আলাদা! এটাই

এই ভাবনার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক! একটা টাইপ ভেঙে আরেকটা টাইপ তৈরি করিনি আমরা, তাই পরস্পরের নিজত্বে সিঁধ কাটতে হয়নি কাউকেই!

মৌলিনাথ : একটা তথ্য প্রায় ঐতিহাসিক মান্যতা পেয়ে গেছে যে শ্রী বারীন ঘোষালের সস্নেহ অভিভাবকত্বে, দূরে দূরান্তরে কবিতার ক্যাম্প/ কলোকিয়াম করে তোমরা একটা নতুন ধারা পেয়েছিলে। অনেক শব্দকে প্রচলিত অর্থ- এ ব্যবহার না করে তোমরা তাতে আরোপ করতে চেয়েছিলে ও পেরেছিলে নতুন ব্যঞ্জনা। আমার *বাংলা কবিতা আশির দশক : একটি নিবিড় পরিচয়* বইটাতে ও অন্যত্র এই কথাটা একাধিক বার বলেছি। আজ তোমার কাছে সরাসরি এ বিষয়ে জানতে চাই।

স্বপন : কবি বারীন ঘোষাল এখনো এই *নতুন কবিতা*'র মূল ক্যাটালিস্ট! *অতিচেতনা* বারীনদার নিজস্ব কবিতাগত ভাবনা! তো আমরা যখন যে যার মত খোঁজ করছি নিজেদের অগতানুগতিক কবিতাভাষার, তখনই বারীন দা'র সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়! আমি *অতিচেতনা/* পড়ে "ধুপশহর" লিখিনি, তবে লেখার সময় আমি জানতাম আমি আমার পুরনো কবিতাভাষা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি! এই বেরিয়ে যাওয়াটা আমাদের সবার মধ্যেই ঘটছিল তখন! বারীন দা'র নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমে এই বিভিন্ন নতুন ধারার লেখালিখি জমাট বাঁধতে থাকে! কবিতা'র ক্যাম্প করতো কৌরব পত্রিকা! আমরা বেশ কিছু ওয়ার্কশপ করেছিলাম, মূলত খড়গপুর আর জামশেদপুরে! এখানে যে মন্থন হয়েছিল তাতে আমরা বিষ পেয়েছি না অমৃত এতো সময় বলবে, কিন্তু আমরা যে যার মত কবিতা'কে খুঁজেছিলাম আর প্রচুর মজা করেছিলাম, এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই!

বাংলা কবিতা'র ধারাপ্রবাহে কত যে হীরে, মণি, মুক্তোর ছড়াছড়ি এটা পাঠকমাত্রই জানেন, তো আমরা যখন ঠিক করেছিলাম পুরনো কবিতা আর লিখবো না, এর মধ্যে কোন ঔদ্ধত্য ছিল না, উল্টে স্ট্যান্ডিং ওভেশনের সেই বিনম্র সম্মান প্রদর্শন ছিল পুরনো কবিতা'র কবিদের প্রতি। তাঁদের নকল করে তাঁদের অসম্মান করতে চাইনি আমরা!

শব্দের কোন অর্থ হয়না, এ আমি বা আমরা বলিনি! সেই কবে মালার্মে শব্দের প্রতীক রূপটিকে এনে বন্ধ দুয়ারটিকে খুলে দিয়েছিলেন! শব্দ ব্রহ্ম নয়, এই বোধ থেকেই কবিতায় প্রতীক এসেছিল, আবার পরাবাস্তবিক স্বয়ংক্রিয় কবিতা'র কেন্দ্রাভিমুখি চেতনার বিপরীতে যখন কবিতা'র খোঁজ শুরু হল, মনে হয়েছিল অনুভবের প্রকাশ এত চিত্রকল্প, উপমা বা তুলনাময় হবে কেন? ইতিমধ্যে কৌরব পরীক্ষা সাহিত্যের বইগুলি আমাদের পড়া হয়ে গিয়েছিল! বারীন ঘোষাল, কমল চক্রবর্তী, শঙ্কর লাহিড়ি এবং স্বদেশ সেন! উচ্চতাটা ভাবো! এ ছাড়া বাংলা কবিতা'র প্রচলিত শ্রেষ্ঠ কবিরা তখন মধ্যগগনে, আমাদের আশেপাশে যারা প্রতিষ্ঠানে লেখেন আর যারা লেখেন না, যারা প্রতিবাদী বা যারা কলাকৈবল্যবাদী তাদের অধিকাংশই কিন্তু প্রায় তিন, চার দশক পেরোন একইরকম ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীতে স্বচ্ছন্দ ছিলেন। বিষয়

তাদের আলাদা করতো, কেউ ছন্দে, কেউ মুক্ত ছন্দে, কেউ বা টানা গদ্যে হাতে গোনা যায় এমন কয়েকটি প্রকরণে কবিতা লিখতেন! ষাট দশকের শ্রুতি/প্রতীকবাদী আন্দোলন এই ছাঁচের বাইরে বেরোবার চেষ্টা করেছিল আর সত্তর দশকে ক্রসেড এবং কৌরব! স্বদেশ সেন প্রতিকবিতা'র চূড়ান্ত করলেন শব্দ আর বাক্যের প্রতিষ্ঠিত আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাকে নান্দনিক রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করে! শ্যামল সিংহ'র ক্যাপসুলড্ কবিতা বাংলা কবিতায় বয়ে চলা ধারাবাহিক আনস্মার্ট ন্যাকামি'কে তর্জনগর্জন না করেই বিদায় জানালো! একে বলে ভেতরের মার! আবহমান বাংলা কবিতাকে বাইরে থেকে অনেকেই আক্রমণ করেছেন, অবিন্যস্ত করেছেন! প্রচুর শোরগোল করে, সাহেব পন্ডিতদের কোটেশন ব্যবহার ক'রে, এমনকি চূড়ান্ত খিস্তিটিস্তি দিয়েও ভেতরের শৃঙ্খলাকে নড়ানো যাচ্ছিল না! কারণ শারিরীক কসরত নয়, চেতনাসিঞ্জিত অনুভবের প্রকাশ হল কবিতা! তাহলে এমন পাহাড়সমান বাধা টপকে যাওয়ার রাস্তাটা কি? আমি জানতাম না, ভাগ্যিস জানতাম না! তাই জলের লজিক আমার প্রকরণ হয়ে উঠলো, কবিতা'র প্রায় সবকটি বিভাগেই জলযুক্তির সঞ্চার ঘটাতে চাইলাম, এর ফলে আমার নিজের কবিতা প্রথমে বিসদৃশ্য হয়ে উঠলো, মনে হল আমি আবার শিশু হতে চলেছি, আমার কবিতা দেয়ালা করছে!

আজ যখন ফিরে তাকাই, মনে হয় কোন ভুল করিনি! কবিতা'কে ছুঁতে পেরেছি কিনা জানিনা, কিন্তু কবিতা'র কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, কবিতা ওমনিপ্রেজেন্ট, তাকে আমি আর নতুন ক'রে কি ভাবে লিখবো? আমি তার কাছে যাওয়ার একটি নতুন রাস্তার খোঁজ করেছি মাত্র, সেই রাস্তা এক উন্মুক্ত দিগন্তে পৌঁছলো নাকি কোন অন্ধ কানাগলিতে আমি জানিনা! আমি শুধু জানি আমি খুব আনন্দে ছিলাম, এখনো আছি, কারণ এই রাস্তাটা আমার....এর সুহানাসফর, এর মূর্ছিত আলোকসংশ্লেষ, ফাজিল চাঁপা রং, রাত- এ রাত্রি'র মৌকালীন রংরেজি, জীবন্ত বাদামময় কুর্তি, 'ভৌরি' নামের বাস আর 'কিছুক্ষণ' লেখা বাসস্টপ, টেকনোউদাস গ্রামগুলি আর আপেল হাতে নিয়ে পুল পেরোবার স্বপ্ন...তো এই রাস্তাও আমি চলে যাওয়ার পরে আর শুধু 'আমার' হয়ে থাকেনি! স্বাভাবিক! কবিগুরু কি সাধে লিখেছিলেন, ''এই কথাটি মনে রেখো/তোমাদের এই হাসিখেলায়/ আমি যে গান গেয়েছিলেম/জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়. . . ''

আমি আমার কথাই জানালাম। কারণ *নতুন কবিতা* ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে ভর করে এগিয়েছিল! কোন গুরুঠাকুর ছিল না! ভাবনা ছিল, তর্ক ছিল, কিন্তু অন্যের কবিতাপথে আমরা কখনো কোন দখলদারি করিনি! তুমি তোমার বইতে সঠিকভাবেই প্রায়োগিক ব্যবহারের বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করেছো! নানাভাবে কবিতা নতুন হয়ে উঠছিল! এই আলাদা হওয়াটা কবিতা'র শব্দ, ধ্বনি, বিন্যাস ইত্যাদি প্রায় সবকিছুতেই ক্রিয়াশীল ছিল! কবিতা'র শুকনো তত্ত্ব নয়, কবিতারসের কাঙাল ছিলাম আমরা!

মৌলিনাথ : তোমরা অনেকেই প্রায় ৪০ জন মত নিজদের পত্রিকা করেছ/ করছ। তবু *কবিতা ক্যাম্পাস, ভিন্নমুখ, নতুন কবিতা* - এরা একটা ঘরাণা তৈরী করেছে। আমি খুব খুঁটিয়ে পড়তে পারি না এখন জীবন ও জীবিকার দায়ে ও নিজস্ব যৎসামান্য লেখার চাপে। তবু আমার মনে হয়েছে তোমাদের ধারাটাকে একটা স্কুল বললে তার কিছু প্রভাব অনুজদের লেখায় দেখা যায়। গবেষণাহীন পাঠের সাপেক্ষে নাম

করা সঙ্গত নয়। তবু জানতে চাই এ বিষয়ে। সম্ভব হলে তুমি নাম করতে পারো।

স্বপন : আগেকার *কবিতা ক্যাম্পাস* থেকে এখনকার *নতুন কবিতা* পত্রিকায় আমরা সবসময়েই তরুণ কবিদের প্রধান্য দিয়েছি! প্রবীন কবিরা স্বভাবতই নিজেদের ফিক্সেসন থেকে বেরোতে পারেন না বা চান না! *নতুন কবিতা* যেহেতু কোন ডগমা ছিল না এবং সময়শাসিত কোন তত্ত্ব ছিল না, ৯০ দশকের তরুণ কবিদের একটা অংশ এর ভাবনাগত এবং প্রায়োগিক নতুনত্বেই শুধু নয়, আমাদের আন্তরিকতাকেও বুঝতে পেরেছিল! এটা ঘটনা যে *নতুন কবিতা*'র আগের বাংলা কবিতা, আর পরবর্তী বাংলা কবিতায় যে শৃঙ্খলাহীন নান্দনিক পরিবর্তন এসেছে তাতে *নতুন কবিতা, ভিন্নমুখ* এবং *কবিতা ক্যাম্পাস*- এর অবদান রয়েছে! এটা স্কুলিং কিনা জানিনা, তবে একটি ধারা তো বটেই! এই ধারায় তত্ত্ব নয়, কবিতাই মুখ্য ছিল! কে ক'জন সাহেব পন্ডিতের নাম জানে এমন হেডকাউন্ট- এ না গিয়ে আমরা একটা নতুন ধারার খোঁজ শুরু করেছিলাম! আমি যদি বলি রবীন্দ্রনাথ আমায় *নতুন কবিতা*'য় নিয়ে এসেছেন তো বাংলা কবিতা'র জাহাজের কারবারীদের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটবেই! ডাডা'র Chance, absurdity, humor, and "anti- art" নয়, সুর- রিয়ালিজমের Freud, Dreams, Unconscious automatic writing নয়, দেরিদার difference নয় যা টেক্সটের শেষহীন সম্ভাব্য অর্থের দিকে তাকাতে বলে, ফারদিনান্দ দ্য সসেরু'র linguistics, structural anthropology and post- structural theories নয়, ল্যাঁকানিয়ান সাইকোএনালিসিসিও নয়, শেষে কিনা রবীন্দ্রনাথ!
হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ! "চে" লেখার পরে আমি যখন নিজের কবিতাভাষা ছাড়া কবিতা লিখবো না এমন প্রতিজ্ঞা করে এমন কি কবিতা লেখাই ছেড়ে দিয়ে শুধু ভাবছিলাম, সেইসময় রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গীতাঞ্জলি আমায় বাংলা কবিতা'র তৎকালীন ছন্দোবদ্ধ এবং সুর- রিয়াল কারাগার থেকে চেতনাগত ভাবে বাইরে নিয়ে আসে, আমি ছ'মাস ধরে "ধুপশহর" কবিতাটি লিখি, আর তখন বারীন ঘোষাল এবং *অতিচেতনা* আমার কাছে অপরিচিত ছিল!
আমার মনে হয় কবিতাধারার মুক্তি নিয়ে আমরা সৎ ছিলাম নিজেদের কাজের প্রতি! পরের প্রজন্ম এটা অনুভব করেছিল, গ্রহণও করেছিল যে যার নিজের মত করে!

মৌলিনাথ : তোমাদের সঙ্ঘ ও সঙ্ঘ ভেঙে যাওয়া নিয়ে কিছু বলবে? আসলে আমি চাইছি এই সংলাপ সৎ হোক ও সত্যের কাছে দায়বদ্ধ থাকুক।

স্বপন : সঙ্ঘ কথাটা কি বন্ধুত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? *কবিতা ক্যাম্পাস* একটা সময় অব্দি "নতুন কবিতা"র আধার ছিল, পরে "নতুন কবিতা" হয়েছে! এর মধ্যে ভাঙাগড়ার কিছু কথা আছে বটে, তবে সেগুলো বন্ধুত্বকে মলিন করেনি! রঞ্জন, প্রণব, ধীমান এবং আমি, আমরা এখনো প্রিয়তম বন্ধু শুধু নই, কবিতা'র সহযাত্রীও বটে! এর চেয়ে একজীবনে আর কি চাওয়ার থাকতে পারে?

আর ধন্যবাদ মৌলিনাথ তোমাকে এবং একইসঙ্গে শূন্যকাল’কেও আমায় এমন সুচিন্তিত প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য!

The feet of morning the feet of noon and the feet of evening walk ceaselessly round pickled buttocks on the other hand the feet of midnight remain motionless in their echo-woven baskets consequently the lion is a diamond on the sofas made of bread are seated the dressed and the undressed the undressed hold leaden swallows between their toes the dressed hold leaden nests between their fingers at all hours the undressed get dressed again and the dressed get undressed and exchange the leaden swallows for the leaden nests consequently the tail is an umbrella a mouth opens within another mouth and within this mouth another mouth and within this mouth another mouth and so on without end it is a sad perspective which adds an I-don't-know-what to another I-don't-know-what consequently the grasshopper is a column the pianos with heads and tails place pianos with heads and tails on their heads and their tails consequently the tongue is a chair

মেগাপর্বজাত ভাষাতত্ত্বের বুজকুড়ি : দ্য মেকিং
কৌশিক চক্রবর্তী

গোলাপিভূতের দেশে ভরে গেছে সিরিয়ালভূমি।
কুচোফুল বালিকালতাও কিছু কম বেশি দ্বন্দ্বসমাসে।
ল্যাকমে পেটিকা থেকে আর্দ্রতা নিয়ে আসে ফুটফুটে ত্বকের মহিমা
তার জানুদেশে জল।
অন্ধকারে শৃগালের পায়ুপথে ঢুকে যায় কাউবয় ছুরি।
প্রমোদে প্রাণিটি ডাকে আউয়া আউয়া
সেটা লিখে রাখি মায়ামোহ কাতরকাকুতি অভিধানে।
এভাবেই বাথরুমে ভেসে ওঠে সাবানের ফেনা
প্রতিসামাজিক এই নাভি খুঁটে চলে যায় ফ্লোরে ফ্লোরে
চোরিছিপে মায়াবিমহলা
ভাষাপৃথিবীর ক্রীড়া থমকায় রন্ধ্রপথে

মধুময় পৃথিবীর ধুলোপানি ভেসে যায় প্রাকৃত ইলু ইলু গানে. . .

প্রথম কবে অপমানিত হয়েছিলাম, আমার মনে নেই। অপমানের ভাষা এত বিচিত্র, এত বিবিধ, যে তার ম্যাপিং করা দুষ্কর। কিন্তু অপমানের প্রতি- আক্রমণে আমার নিজের ভেতরে একটা ভাষাপৃথিবী তৈরি হয়ে উঠছিল। এ লেখা যে সিরিজের, তার জন্মকাল ডিসেম্বর ২০০১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৬ – এই সময়। তখন বয়েস আরও কিছুটা কম, রাগে, ক্ষ্যাপামিতে, রোষে – প্রায় ফুটছিই বলা চলে। যদিও তার বাইরে দূরে প্রকাশ করতে পারছি না। তখনও কথা বলতে পারি না তেমন, ভেতর ভেতরে গুম মেরে থাকি কেবল, আর ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়তে থাকি। সেই রাগ এক নিজস্ব ভাষার জন্ম দেয় – সব কিছুকে তুচ্ছ করার ভাষা, তাচ্ছিল্য করার ভাষা, নস্যাত করার ভাষা।

অপমান তো নানা ভাবে আসে – সামান্য কেরানির চাকরি করে আত্মীয় বন্ধুদের করুণা, বিদ্রূপ কুড়োনো, সে যেমন এক অপমান, তেমনি আবার তেড়েফুঁড়ে প্রেম করতে গিয়ে সমূলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে চোখের সামনে সেই খোয়াবের মেয়েটিকে মোটা মানিব্যাগের ফর্সা স্মার্ট গাইয়ের হাত ধরে চলে যাওয়া বোকা বনে দেখে নেওয়াও আর এক ধরনের অপমান। ভরা বর্ষার রাস্তায় বড়লোকের বাচ্চা যখন দামী গাড়িতে চড়ে পাবলিকের গায়ে জল ছিটিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়, তখন আমার রাগে মাথা দপ্‌দপ্‌ করে, মনে হয় একটা থান ইঁট তুলে সপাটে উইণ্ডস্ক্রিনে ঝেড়ে দিই। যখন টেলিভিশন খুলে দেখি বোকা আর বানানো সিরিয়ালের আকাশকুসুম আমার বাড়ির মগজে ভাইরাস ইঞ্জেক্ট করছে, রঙিন ঝলমলে পাছাবুকপেট নিয়ে পর্দার ভেতর থেকে কলাকুশলীর দল যখন হাসতে হাসতে চলে যায়, আর আমি ক্যাবলার মতন ল্যাজ আছড়াই – আমার অপমানিত লাগে।

এই লাথি মারার রোষ, খিস্তি করার রোষ – আমাকে রিট্যালিয়েট করার ভাষা দেয়, ক্রমশ বুজকুড়ির মতন সেই ভাষা ফুটতে থাকে ভেতরে। জীবনের সেই পর্ব ছিল আমার নিজস্ব সোপ অপেরা। তার মেগাপর্বে এইসব বুজকুড়িরা এই সিরিজের লেখাগুলোকে ছিপ ফেলে তুলে আনে।

আমাদের যুবকবয়েসী কলকাতা শহরে এক দশক আগে এক নিজস্ব ভাষাকাঠামো ছিল। আমাদের বাংলা তখনও মাল্টিমিডিয়া বার্তা শাসিত অথবা বিকিকিনির মল- লাঞ্ছিত হয়ে ওঠেনি। আবার একই সঙ্গে সে ভাষা ছিল প্রথাগত ভালো ছেলেদের ভাষার থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরত্বে। এ ছিল কলকাতার এক নিজস্ব ডায়াস্পোরিক ভাষাপৃথিবী। কলকাতার মধ্যেই, আবার কলকাতার বাইরের এক বহির্কলকাতা। আমাদের সেই ডায়াস্পোরা অবশ্য যতটা না রাগী, তার চাইতে বেশি ফাজিল, উইটি। এই সিরিজ – করোগেটেড ওভারডোজ – এর প্রত্যেক লেখাতেই সেই উইট, সেই ফাজলামি, আবার একই সঙ্গে চোরাগোপ্তা রাগ ব্যবহার করেছিলাম।

আমার এখনও মনে হয়, অপমানের সবচাইতে ভালো রিট্যালিয়েশন হতে পারে তাকে প্রাথমিকভাবে তাচ্ছিল্য করা। ইনডিফারেন্স নয়, ইগনোরেন্স। আবার এও তো সত্যি, আদতে গাড়লেরা, অপরকে তাচ্ছিল্য করে, নিজে কলার তুলে, হিরোসুখ অনুভব করে। করোগেটেড ওভারডোজের কবিতারা সেই বোকাহাবার কলার তোলার কাহিনি।

শুধুমাত্র চারপাশের সময় নয়, অর্থনীতি নয়, আশেপাশে পড়ে নেওয়া দেশবিদেশের ন্যাকা কবিতাগুচ্ছ নয় – আমাদের আরও কিছু বিপন্ন বিস্ময় ছিল – যা ছিল আমার এই তাচ্ছিল্যের টার্গেট। আমরা তো আসলে কবিতার দেশে থাকি না। আমাদের কবিতা আসলে ছিটমহলের বাসিন্দা।

‘গোলাপিভূতের দেশে ভরে গেছে সিরিয়ালভূমি’। এ লেখা যে সময়ের, তখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মতন মেগাসাইজ বাংলা সিরিয়ালের বুম্‌ ক্রমশ আমাদের সন্ধেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে পুরোদমে। সমকালের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে বাংলা গান চোখা মেজাজ গায়ে মাখলেও, চোখের সামনে ভেসে থাকা বাংলা কবিতার বাজার হয়ে উঠছিল ন্যাকাগোলাপের আদিখ্যেতা। বিজ্ঞাপন শুধুমাত্র আর মুখ নয়, দর্শকের লিঙ্গের দিকেও হাত বাড়াতে শুরু করেছে তখন। কান পাতলে শুনতে পাচ্ছি – ‘‘আপনার বাড়িই আপনার পরিচয়’’। মনে হচ্ছিল, এক ধারসে, আমরা যেন পাছা মেলে দিয়েছি, ইজ্জত খোয়াব বলে। ‘শৃগালের পায়ুপথে ঢুকে যায় কাউবয় ছুরি’ লাইনটার জন্ম সেখান থেকেই। আর সব শিয়ালের মতনই যেন শীৎকার করে উঠছি, আরও, আরও। শহরে নতুন পন্যবিপনি হয়েছে, তার পেটের মধ্যে সেঁধোলে মিনি সিঙ্গাপুর লাগে হে ! ছোটবেলায় শোনা একটা গান মনে পড়ে যায় – সারে জাঁহা আহা নাচে

নাচে, আউয়া আউয়া... কবিতা মধ্যে সে- ও ঢুকে পড়ে কখন। আমি টের পাই, আমার মধ্যে একটা ইয়ার্কি ফাজলামির সিডি পোরা আছে। এই লেখাগুলো যে সময়ের, তখন সেই সিডি ফুল ভল্যুমে বাজছে। আউয়া আউয়া... আহা কলকাতায় কী বীভৎস মজা !

আমি শুধুমাত্র সময়কে নিয়ে ইয়ার্কি মারিনি, আমার চারপাশের যে কবিতা, যে সিনেমা বা যে গান আমায় শান্তি দিচ্ছিল না, নিজের মতন করে আমি তাদের দিকেও ইঁট ছুঁড়েছি। তাই কখনও 'যে জিরাফ গিয়েছিলো/ দমদমে খোলা হাওয়া নোনাজল খেতে তার গায়ে আঁকা/ ফুটপাথে মুতিবেন না/ ব্যস, ধম্মোটম্মো সব ভোগে/ এহ বাহ্য বাকি যত বিদ্‌ঘুটে অদ্ভূত চাহট যত ম্যাড়ম্যাড়ে টিকটিকি জীবন. . . ' আবার কখনও 'এসো গুরু নীপবনে চুপিচুপি ঝাড়া বিড়ি খাই। ছায়াবীথিতলে/ তার রেশমের মেটাল বোতলে কিছু টিপিকাল ছোটোলোকিপনা।/ উদার অর্থের এক নীতিকথা শুনে আসি সভাসদ লোমের ভবনে/ অরণ্য একে বলে. . . ' আবার কখনও লেখা হয়ে গেছে 'প্রেতের বিস্তার খুব বেশি নয়, ভিক্ষে করেই তারা/ কঠিন ও কুখাদ্য খায়.../তারপর গাছ থেকে ঝাঁপ দেয় বড়জোর ৫০ দশকে.../ পরিচিত দর্শককুল এসব তত্ত্বের সামনে ঘেঁটে গিয়ে/ কিছুটা কেলুর মতন খালি খালি বগল চুল্‌কোয়. . . '। ইচ্ছাকৃত ভাবেই একটা হাল্কা ছন্দের ব্যবহার করেছিলাম। মনে হয়েছিল, এটা দরকার। যাতে জোর কা ঝট্‌কা ধীরে সে লাগে। নয়ত এ আর কবিতা থাকবে না, পাতি স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে। আমার অ্যাজেণ্ডা ছিল, এই ভাবনাগুলোর, কলকাতার ডায়াস্পোরিক ভাষার একটা কবিতা- ডক্যুমেন্টেশন। ভাবনারা তার পর অনেকখানি সরে গেছে। যে কারনে, এ কবিতার ফর্ম থেকেও পুরোপুরি সরে এসেছি তারপর। এই কবিতা, এই সিরিজ, এই বই – এখন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ইতিহাস ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।

এই সিরিজের কবিতারা – চশমার আলোযুগ ঘিরে, সেডেটিভ মডেলের নিয়ন্ত্রিত মাঘমাস, সেন্টু সেক্স কফির আলেয়া, প্যান্টিক্লক গতিপথ ঘিরে, অবাধ্য ঘুম জলীয় প্রতিভা – কিছু কিছু ছাপা হয়েছিল পত্রিকায়। এই সিরিজের লেখাগুলো নিয়ে ২০০৭ সালের কলকাতা বইমেলায় কৃশকায় দু- ফর্মার একটা বইও প্রকাশ হয়েছিল নবারুণ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে, প্রকাশক ভাষাবন্ধন। বইয়ের নাম দিয়েছিলাম – করোগেটেড ওভারডোজ। ওভারডোজ, কারণ, লেখাগুলো প্রায় নেশার মতন মাঝে মাঝে ঘুরেফিরে এসেছিল। আর করোগেটেড, কেননা, আতা- পাবলিক শেষমেশ হাজার তড়পালেও, নিজেকে মোল্ড করে, সুন্দর সহজ ঢেউ খেলিয়ে, আদতে মানিয়েই নেয়। বেরোবার পরে, দুশো কপি বই যথারীতি হাতে হাতে বিলি, নিজ খরচে ক্যুরিয়ার। তারপর, মহামতি বারীন ঘোষালের একটা চিঠি, আর ভিন্নমুখে একটা রিভিউ। ব্যস্। খেল খতম, পয়সা বদ্‌হজম।

স্বকাব্যকথন

একটি শীর্ণ সরল
অভি সমাদ্দার

একটি আয়ু। তাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটি। জ্যোৎস্নায়। যে আতাটি নির্জন নিসর্গ দোলায়। সেই দৃশ্যে, নিভৃত ঝুঁকে থাকি। স্থির জলে চাঁদের প্রতিমাটি। সামান্য কাঁকর ছুঁড়ি আলোটির অনুবাদে। অথচ আলো ভেঙে যায়। ভেঙে যেতে থাকে। সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে বিজনের এইসব। নীচু নিভু।

ফিরে আসি শুষ্ক রোজদিনে। চোখের, মনের ব্যবহারিক মুদ্রায়। নিয়নের নীচে মানুষজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়। তবু ছেঁড়া পথে কুহুচুর লেপ্টে থাকে। মাঝে মাঝে দূর্বা ফোন করে। তার একার্তির আয়না শুনতে পাই। দেখি সে, মোরাম সুহৃদ টং হয়ে আছে। কখনো তার কন্ঠস্বর ললিত ধরে রাখে, কখনো কর্কশ। অবশ অবিরল কথনে ঘাসেদের ঘুম ভেঙে যায়।
এইসব টুকিটাকির মধ্যে আমি 'হৃৎ' খুঁজে ফিরি। গ্রামদেশের ডাকনামে তাকে বলি- মেথি, তুমি কি বিবিধে ভাঙছো বিজন? অস্তিত্বের হলুদ? না কি আমিই খুঁটে নিচ্ছি তোমার নিষ্ঠ দানা। আহ্ দানার হৃদম্!

ল্যাটেরাইট শিরা উপশিরায় এই 'স্খলন' বয়ে বেড়াই। ইউক্যালি দীর্ঘতা ছুঁয়ে নেমে আসে তারার আবহাওয়া। হাঁটি। দীর্ঘ সব ছায়ার ভেতর। যেন মর্মর না ওঠে। শরীরে সমাধি প্রবাহের রাত। শীর্ণ সব সংখ্যারা আমাকে অলীক করে তোলে। সামান্য নুন আনতে পান্তা ফুরনো শব্দেরাও ঝিম টুকে নেয়। আড় নয়নে তাকিয়ে হাসে 'নিছক' ।

সরু নির্মিতি রেখাটির চিৎকৃত- নীরব। একটানা করাতকলের শব্দ ভেসে আসে। শুধু নিমকাজের সময় দিনে দ্বিগুণে বাড়ে। আমি আর দূর্বা একে অপরের জামা বদল করে বসি সাদা তরলের দু'দিকে। শুরু হয় টোল নিটোলের উল্লাস! আর বিভাজিত তরলে আমরা প্রতিকৃতি হারিয়ে ফেলি। 'প্রতিকৃতি' 'প্রতিকৃতি' তোমার জোছন টল ভ্রম।

অসংখ্য যুক্তির ভিড়ে দূর্বা তার জামাটি হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখে। আমি হৃৎখুঁটে যেটুকু অন্ধকার তার হ্যাংওভার জাগিয়ে রাখি। থকথকে কূপের গঠন ছাড়া কবিতাকে অন্য কোনো সন্দর্ভে ভাবা হল না। কোনো নান্দনিক কিছু টের পেলাম না। আকাশের গলায় আকন্ঠ চাঁদ ছাড়া আমার তেমন কোনো নিসর্গ হল না। হল না কেন?

হৃৎজুড়ে জমাট ঠান্ডা পুষে রাখি। চারিদিকে মানুষের পরম চলাচল। দাঁতের সহজ সারি। তবু দেখো হীন ফুটে ওঠে না। মর্ম ও মেথির সান্ধ্যতাঁত লিখিত কদমবুসি দেয়। জ্বরগন্ধের ফলন প্রক্রিয়া।

একটু একটু করে শীর্ণ'র যোগ্য হয়ে উঠি। ক্রমে 'সুলতান' নামক অবয়ব নিয়ে উঠে আসি সাদা পাতাটির বিক্ষোভে। ক্রিয়া ক্রিয়া কুসুমে চূড়াবিথীদেহের তীব্র তরীডাক। বিভাব গড়ে তোলে। গুল্মের গঠন পায়। ভাবি বিষয় কি চিরাচরিত মোক্ষ- আপেল! শব্দ কি সমস্ত হয়ে নৈঃশব্দের আলোটিকেও ধরে রাখে আমার সৃজনে, প্রকরণে। সন্দেহ হয়। প্রতিনিয়ত। ক্রমে নির্জন মেখে নেয় দু'ছত্রের আত্মন্। কিম্বা বিশুদ্ধ শ্লেষ্মার বিবরণ - -

চই চই- ৪

১.
রাতের স্বল্প গুল্মদেব
আঁতের চই চই দিনলিপি
ত্বকেই রোজকার কালশিটে
মোক্ষ- আপেল তার ছায়া মাপি
এবং সখ্য তরল- নাম
দানার দৃশ্য খুব তলে
রুইছে পথ্য দিনের দিন
দ্রবণ- নিষ্ঠ ক্ষার জলে

২.
আর আল্ভো আলোর অঙ্গে
তিমির বিন্দুগুলি বসাই
সকল নিমকাজ
ধানি মর্মবিদের!
সজল বোতলগুলির দৈবে
রি রি প্রতিমাটি
নচেৎ অঙ্গ হারাই

৩.
এভাবে এক সরল
রেখাটি মশগুল
সুলতান

মাখি

সলতে পুড়িয়ে
তোমারই দিনকাল
তোমারই রোদ্দুর
ভিজিয়ে নিচ্ছি, জাস্ট
স্থা- টি জড়িয়ে

স্বকাব্যকথন

একটি রাধে ঘোষ প্রকল্পঃ
নিতম্বে মৃদঙ্গ বাজে খাপখোলা থাপ্পড় . . . . . .

জৈব

নবনিতি রাস্তা বলবো, সেই কুঁচির ঝোপের ওধারে কুঁড়ে
নিতি সঙ্গই বলবো আর কুয়োর কিম্বা মরা মুর্গির
নির্জন পালকেরা কিশোরীর দর্শকাম রূপোলী
মোম সামলায় রূপোলীই বলবো যে কারণে শ্যামবর্ণ চশমার
ডাঁটি খুলে রাখা ক্রান্তি সরের ঝোপ ধারণ করে থাকে

ইতিহাস ধারণের এই পঞ্চায়েতি বাঁধ একে অন্ততঃ
পঞ্চায়েতি- ই বলবো, যে কারণে কুয়াশার অন্দরে
ঐ কুয়ো, শঙ্কু তার মহল ছুঁয়ে
সিস্টেমের মাথায় বসলি না শঙ্কু, এই দিবসটির গলায়
দড়ি বেলায় নাভির পাপড়িতে কুন্ঠিত কূপ
রাস্তায় নিতি কিশোরীর সেলকম উৎসারণ
লিখিত চঞ্চল অন্ততঃ মাস্টারদের ধাতব উল্লাসের
একটা রাস্তার পর একটা রাস্তার মোড় —

২.
প্রণালীর ঘাড়ে চড়ার বদলে
পন্থারা আমায় নুড়ি, মাটি জল
পাতার ওপর
গলা মাথা ঘাড় সোনালি খড়
শিরিষ খামার
পাগল রাস্তার পদে ঘূর্ণি শঙ্কু, এইসব
কূপের নিবিড় ধ্বনি ক্রান্তি চিহ্নিত করে
শ্বেত সরের ঝোপ পাঁচজনের মাথার ঘাম- ঝরা
অড়হর নিষাদ অথবা কুয়াশার ধামাধরা আলুক্ষেত
ত্রিশঙ্কু দেহপটের অর্জুন বৃত্তিয় সঙ্গীতের কড়া
ধরে মেজরগুলি রোমান্স তো মাইনরগুলি
অতিবাস্তবতা
আর সেই পাগলা রাস্তার বাস্তব পন্থারা
টইটুম্বুর বাঁধের একলা কিশোর
সেচকার্যে এই অনুধাবনটি রাস্তার নিতিটি
অথচ বিপর্যয়; জৈববুদ্ধির এহেন নির্ধারিত ধাবন
ব্যষ্টির শঠতা ছাড়িয়ে চশমার ডাঁটি খোলা
মহল্লা ছুঁয়ে ফ্যালে

৩.
হাসপাতালে নিতি প্রজাপতি ছেড়ে দেওয়া হয়
ইতিউতি বিষরেণু, শ্বেতসিস্টার স্মিত
নয়নে কুসুম পরাগ, দৈত্যাকার সার্সিকফিনে
সওয়ার ছোটফুল পাতা- ঝরা —
কড়িকাঠে ঝুলন্ত বেতাল কুয়াশার শঠতা
বিবিধ জ্বরজারি প্রশ্নমালা পেরিয়ে ফুলকিশোরীর
জানুতে জরুরী বাস্তবতা মোচন —

গর্ভে দর্শমোম সঞ্চার
এইসব জৈবকে তবে হাসপাতালই বলবো

৪.
প্রণালীর ঘাড়ে চড়ার বদলে অভি আমার
ঘাড়ে একটা ছলাৎ নদী, কিছু মৌ মন্থন
কিছু আমার মেয়ের খেলনা সটান পাছার ঘোড়া- রাজ্য
আহা সেইসব স্বাধীন ঘোড়াদের বৈভব . . . . . .
যাই বলি না কেন, কোন না কোন নেশায় তলিয়ে যাওয়া
বনভূমি, খেজুরের আঙুরের মালিকানাধীন নিজস্ব
গড়, রাজবাড়ি, রাজা উদয়ভানু

তবু উদয় লগ্ন কুঞ্জ, উদ্যানময় সার ও বস্তুতে ইতিহাসের নুন
আজন্ম ফ্রেমে এক নিবিড় জোড় এবং আশ্চর্য্য তার ঠিক পাশে
শঙ্কুর অনুপস্থিতিজনিত কিছুটা কালচে কুয়াশা
কেন এসব কুয়াশার অবধানে রহস্যমূলক সিধান্ত হয়
কেন হাসপাতালে প্রজাপতি ওড়ে, হাসপাতালের
অরৈখিক অবয়বে জুনিয়র ডাক্তারদের শ্রম ও পাঁচের
গুনিতকে অভির শরীর ক্রমে সেরে ওঠে
এবং এইসব খড়পাতার বিকাশে সে অন্তত একটি প্রশ্ন
ছোটপ্রশ্ন ও রোগমুক্তি হতে পারে

৫.
আর দ্বিপ্রহরে মাতৃসকাশে বন্ধুর রোগ
মনিমুক্তো ক্রন্দনে ছোট ছোট তড়িৎকণা, বাষ্পঘন
তীব্র তমঘ্ন, রূপান্তরে বৃষ্টির জৈব;
শরীরে উইয়ের ঢিবি ঝেড়ে আচম্বিৎ অবিনাশী
ইশ্বর কোন বিনিময়দন্ড বা দন্ডায়মানতাকে
চ্যালেঞ্জ জানিয়ে

রাশি রাশি বুদ্ধিমণিকণা ধেয়ে আসে এখানে
এই করলা- কারণ- কুটিরে, রাশি রাশি অতিবাস্তব
লম্ফ, নিজস্ব নির্বাণে করলার ঠান্ডা জঘন
লোডেড ট্রাকের শব্দে পন্থারা বুক চিতিয়ে দ্যায়
এইসব ঘটমান শৃঙ্খলাকে অমি বুদ্ধিই বলবো

৬.
তাবৎ আলোচনা শেষে এইভাবে বাঁশবন ঠান্ডা ভাতের স্মৃতিনির্যাস
এবং দু একটি পাখির ফিঙে, এজন্মে মামাবাড়ি রোমহর্ষক
গাঁদার দৃষ্টিকোণ আলো- করা 'আছে', আছেই বলবো
এবং অস্তি যদি আশুতশেকড়ে বাক্যের সংগঠন, কূপ খননকারী
শ্রমিকের গাথা না হয় যদি আলোচনা শেষে নির্জন শৈশবে
কৌশিক কাঁপন ছড়ায়
এভাবে নিরালায় . . . . . .

৭.
সকল সম্পর্কের শেষে ফের খনন
খ- ন- ন- য়ের সংসক্ত আলো ভাদ্রের ভরা
কোদাল চালনায় ফের শিশ্নের ঘেমেনেয়ে আলোচনা
ছিদ্রময় কর্দম, তোমাকে অনুপস্থিত মাটির সারপ্লাস শ্রমের
তোমাকে সফেদ স্পৃহার, তোমাকে অবিরাম অমূল্য
জলের, তোমাকে উৎসের লিরিকের দিকে খননে . . . . . .

মহা বিপদে ফেলেছেন আমাকে। আসলে আমি কিছু জানি না। কি করে হয়। আমি তাঁদেরি উত্তরসূরী যারা জানে না। এটা বলতে আমার ভাল্লাগছে না, কেননা আমি সেভাবে কারোর descendent নই, নাহলে এত ছায়া গর্ভে জমাতুম না- কিছু কথা মনে হয় 'রয়ে যাচ্ছে' রয়ে যাচ্ছে ..... সেগুলোয় লিখতে হয় — নাহলে 'কবি' হয়ে উঠতে কে চায়? সব ছারখার করে। সবকিছুকে। আর আমি হোলটাইমারও নই। মানুষের ভিড়ের মধ্যে তো ঢুকে পড়াই যায়- প্রবাহের মধ্যে। কণিকা বহমান হয়ে চর রচনা করতে করতে; জিগজ্যাগময়তা, ছায়া, গ্রাম, কাঠের সেতু, ঘাটের বাঁধা খদ্দরের নৌকো; একবার একটা ছোট খালের পিছু ধাওয়া করে তার মনখারাপের পাহাড়ে মুখবন্ধ দেখে ফেলেছিলাম। সেবার প্রথমবার কোন একটি যুবতীর সঙ্গে দিনকয়েকের ঘোরাঘুরি পর্যন্ত

গড়িয়েছিল। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করছি। একদিন কয়েকজন মিলে গেলাম গোপগড়। এসে গেছি বুঝতে পারছি। বাদামের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাইক যাচ্ছে। কী অসম্ভব ভাইরাসের উত্তল রিং। বিবহরেণু । একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়েছি। নীচে গো- ধূলি না কুয়াশা না মেঘ না ছায়া ঘটে চলছে দৃশ্যগুলির ওপর। এক হিরন্ময় মৃত্যু- উপত্যকা। প্রাসাদের ইঁট থেকে উঠে এসেছে ইতিহাসের নুন। বায়বনুনে ভাসছে দৃশ্যগুলির কোলাজ, জগৎসংসার। এসবের মধ্যে একটা বেঞ্চের ওপর বসা জোড় হঠাৎ ফ্রেম হয়ে গেল, পরে বুঝেছি। চোখের পাতা তখন ভার হয়ে এসেছে। সমাহিত অ্যলকোহলের মতো। আসলে কোথাও একটা ট্রিগার করে রিয়্যালিটি তখন রচিত হতে শুরু করেছে। যেমন, আদৌ জোড় দেখেছিলাম নাকি একটি সালোয়ার পনিটেলে একাই ছিল এবং পাশে যেন একজনের উপস্থিতি সেইমাত্র স্তিমিত হয়ে cease করেছে এবং উপস্থিতিজনিত একটা স্থির থম একটা কুয়াশাপ্রপঞ্চ রয়ে গ্যাছে।

আর ঐখানে এসে 'জৈব' কথাটি প্রবেশ করে। কেন জৈব, কী জৈব, কিসের জৈব কিছুই জানিনা। অনুবাদ শুরু হয় সেখান থেকে। বিভিন্নকে ধরে নামাতে শুরু করি। পড়তেও ভয় পাই, আমার জৈবটি হারানোর।

গন্ডদেশে জমা দর্শন ও ভূয়োর (ভূয়ঃ) অনুবাদ।

কতদিন ধরে চলছে এসব কবে শুরু করেছি লিখতে, করা- পাত্রখানি গ্যাছে খসে প্রেমে, শত শত জৈবের পল্লবনে বয়ে চলেছে প্রেম, সফেন পল্লবনের বিশুষ্কতার কুণ্ঠায় কূপে গম্ভীরায় তার ফসিল।

এইখানে এসে সঞ্জয় বলে একটি ছেলে মারা যায়। গলায় দড়ি। দৃশ্যত কোন কারণ ছিল না। ঘটনাক্রমে ও ছিল আমার ছাত্র, আমার স্কুলে পড়াত। মেধাবি, অসহ্যরকমের introvert । জঙ্গলের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে সম্ভবত একটা অর্জুন গাছে ওকে পাওয়া যায়। বাতাসে পা রেখে দাঁড়িয়ে। গত কয়েকদিন আগে যে শার্টে ও স্কুল এসেছিল। আমরা দেখছি সবাই। এই তো পাওয়া গ্যাছে। নেমে আসবে। জঙ্গলের ভাঁজের পর ভাঁজ পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে। ওর ঘর বুঝি। অর্জুন গাছটিকে ঘিরে একটি রুমের মতো জায়গা। ওকে ঘোরানো হল আমাদের দিকে। অদ্ভুত ব্যাপার। ও তো নেই। শার্ট আছে। হাতা আছে। প্যান্ট আছে। মাথার চুল অব্ধি আছে। ও নেই। আমি আর দেখতে পারিনি। A faceless man. A very obnoxious black stills .....এই switching off and on of presence and absence এখনো চলছে। Presence with its every detail and absence with the still and quintessential fog or heaviness of presence.

এই তো সেদিন কাকলীর ব্যাপারে: গৃহস্থ থেকে অনর্থ; সেই একই প্রলম্বন। তো, এই না- থাকা বা থাকা জুড়ে গেল গোপগড়ের সালোয়ারের প্রেমিকের সাথে। এখন মনে হচ্ছে ঐ ঝুলতে থাকা সঞ্জয়- ই সেঁধিয়েছে শঙ্কুতে। মনে পড়ে লেখাকালিন আমি একটা স্মার্ট নাম দিতে চাইছিলাম শঙ্কুর, পারছিলাম না। বোধয় এই ঝুলন- ই শঙ্কুর জন্মরহস্য, বাইরে কে কি বল্ল জানিনা। এমনকি আমি জানিও না এপিক কী, তাতে কি হয়! কিন্তু আমার ভেতরে জল বাড়তে থাকে। Throat- level inundation র‍্যাডার ডুবে যাবে এরম। পৃথিবী ভাসবে। একগ্রাম পৃথিবী। নিম্নতম কণিকা ভাঙ্গে। তরঙ্গ ছাড়ে। প্রোপরস্যান নড়বড় করে। বি—ভি—ন্ন খোসা ছেড়ে চরিত্ররহিত ন্ ন্- র জায়মান বোধ করি implanted হয়। সঞ্জয় ঢোকে শঙ্কুর ভেতর, শঙ্কু কুণ্ঠার, কুন্ঠা কূপের; এবং 'পাখির ফিঙে' অর্থাৎ ফিঙে ঢোকে পাখির ভেতর 'এবং অস্তি যদি আশুতশেকড়ে বাক্যের সংগঠন' এবং 'খ—ন—ন'- য়ের সংসক্ত আলো ভাদ্রের ভরা / কোদাল চালনায়

ফের শিশ্নের ঘেমেনেয়ে আলোচনা ……’ এই সংসক্ত কোথা থেকে এসেছে বা অস্তি কিভাবে আশুতশেকড়ে বাক্যের সংগঠনের সংগে গেল, এই সংঘটনের রহস্য, আর ভাদ্রে কোদাল এত অনপনেয় ছিল, লেখাকালিন থমকাচ্ছিলাম, কি—হচ্ছে—কি এবং শেষ অবধি কোদালের সংগে শিশ্ন — কিন্তু বড় জরুরি ছিল এই ইকোয়েশ্যান।

ঐ নিম্নতম কণিকা ভাঙনের শব্দ শোনা যায় কতগুলো recurrent motif- য়ে —ক্রান্তি, শ্যামবর্ণ চশমার ডাঁটি খোলা মহল্লা, একটা রাস্তার পর একটা রাস্তার মোড়, এই ‘জৈব’- য়ের উদগমন, এইসব খড়পাতার বিকাশ, ছোটপ্রশ্ন ও রোগমুক্তি, তীব্র তমঘ্ন রূপান্তরে বৃষ্টির জৈব, এইসব ঘটমান শৃঙ্খলাকে আমি বুদ্ধি- ই বলবো, কৌশিক কাঁপন ছাড়ায় এভাবে নিরালায়, তোমাকে অবিরাম অমূল্য জলের, উৎসের লিরিকের দিকে খননে ..... প্রত্যেকটা স্তবক- ই নিজেকে পেরিয়ে ঐ মহল্লা ছোঁয়ার স্বপ্ন ধরেছে। এইসব, এই epical inundation পেরিয়ে নোয়ার নৌকোয় উঠে হয়েছে এবং এই ‘জৈবে’- র predecessor হয়ত লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার . . . . . .

না- জানার কারণেই সব ঘটছে। অভিকে দেখে এলাম হাসাপাতালে। Diagnosis হচ্ছে না। জ্বর ছাড়ছে না। ও বোধয় চলে যাবে। জৈবজগতে নেমে আসবে আঁশটে অন্ধকার। দুপুরের বিক্রিয়াবান্ধব রোদে মায়ের পাশে শুয়ে কাঁদলাম নাকি চোখের জল বেয়ে হরিৎবুদ্ধি নেমে আসতে লাগলো — যখনই মাঠে দেখি ঐ ফসল পাহারার তালপাতা বা খড়ের ছাউনি, ঐ করলা—কারণ—কুঠির, বিবাহবুদ্ধি উপস্থিত হয় সংগমের গর্ভিনী ঘাড়ে সওয়ারী হয়ে গোড়ালি- ডোবা অন্ধকারের ছলাৎরাজ্যে পা ফেলতে; রাশি রাশি অতিবাস্তব লম্ফ, নিজস্ব নির্বাণে করলার ঠান্ডা জঘন/ লোডেড ট্রাকের শব্দে পন্থারা বুক চিতিয়ে দ্যায় / এইসব ঘটমান শৃঙ্খলাকে আমি বুদ্ধি–ই বলবো।

কিছুদিন আগেই ঘুরে এসেছি এইরকম একটা ট্রেকিংয়ে। ১,২,৩,৪,৫ লেখার পর মনে এল এ- কোথায় যাচ্ছি, কার পিঠে, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছি ! তাছাড়াও বউ এল। বিঘ্ন ঘটলো। বিয়ের পর আর আর ভর হয়নি আমার। এরকম লেখা ছেড়ে দিয়েছি। লিখতে এসেছিলাম স্তন ও নিতম্ব সম্পর্কে বিস্ময়ের কারণে । বিয়ের পর তাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভিড়ের মধ্যে নেমে গিয়েছিলাম। বাতাসে একটা দুটো মুদ্রা ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে হল। নাচতে। নাচলাম। হচ্ছে না। আবারো কেন লিখছি জানি না।

স্বকাব্যকথন

পায়ের প্রলাপ
রিমি দে

প্রবাল ও পা

পায়ের গভীর থেকে খসে পড়ছে
আমার অতল পাতাল
ঘনঘোর বুক ও চিবুক নিথর

মাথার ভিতর ঢেউএর কালোতম স্রোত। আপাদমস্তক উত্তেজনার উথাল। হৃদয়ের লাবডুবের নিজের অজান্তেই স্থানান্তর ঘটছে ইতি উতি মুহুর্মুহু। শিরার দপদপ আর গোখরোর হিসহিস কন্ঠনালী চেপে ধরছে ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর ভঙ্গিমায়। কে যেন রুদ্ধ করে দিচ্ছে বাকশক্তি। একটা হতভম্বের মত মাংসপিণ্ড হয়ে যাচ্ছিলাম। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে অপারেশন থিয়েটারে তখন লাল আলো জ্বলছে, আর আমার গোটা রক্তিম জুড়ে বরফকুচির দিন। থুড়ি রাত, নানা থুড়ি দিন। থুড়িথুড়ি, রাত দিন কিছুই নয়। কুরে কুরে খাচ্ছে বেদনার গাঢ়তম লাল।

মাথার ভিতরে মত্ত থাকে ব্যাকটেরিয়া
পা ও পাতার পাথরে আমার মাংসল মন

পায়ের পোকাদের খুঁটে খায়

একটি গোধূলি কিংবা রাত ও একটি সোফার নরমে আমার কঠিন। নিহত ধোঁয়ার মত কে যেন জড়িয়ে রেখেছিল জানিনা। গর্তের অন্ধকার থেকে আমার ভিখিরিরা কী যেন বলে গেল, কী যেন ! ওদের ঝরাপাতা পোশাক ও মুখ বোঝা যায় কিন্তু চোখ নাক ঠোঁট আলাদা করে চেনা যায়না। আমার ভিক্ষুকের নীরব কান্নায় আমার নিবিড় খুলে যেতে থাকে একটু একটু করে। খুঁজে চলে আঙ্গুল, ইউটেরাস ও ফ্যালোপিয়ান টিউব। তলপেট ব্যথা করে ওঠে চিনচিন। সেখানেই তো আমি ও আমার জমাট রক্ত একসাথে কেঁপে উঠি একটি নির্দিষ্ট বলয়ে। মুমূর্ষু রোগীর মত অন্ধকার গিলে ফেলি আর সে আমাকে। এ যেন পারস্পরিক বোঝাপড়া।

খেয়ে নিচ্ছি ডেডসেল
খেয়ে নিচ্ছি আমার অহংকার
লালদোপাটি

তিন তিনটে মুঠোফোন ঘিরে রেখেছে। গোগ্রাসে গিলতে চাইছে আমায়! !

তখন লতানো দেওয়ালের মুখোমুখি
হরিণ চেটে নিচ্ছে আহত কাজল
ঘোলাটে হাসপাতালে আমি ও আমার
মৃতঘুঙুর

খুবলে খাচ্ছে ডেডসেল
খাবলে নিচ্ছে স্কিন গ্রাফটিং
পাতাল নিহিত পা
আমার সন্তান

নীল মানুষগুলো অ্যাপ্রনে ঢাকা। আমি কয়েক হাজার কিলোমিটার। দূরবিনের ভাঙ্গা লেন্স। লাল নীল গোলাপী প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে যাচ্ছে আমার পা। যেন নাড়িকাটা সন্তানের পা। গোড়ালির মুখ হাঁ করে খোলা। খোলা জানালায় আমার হাজার চোখ পথ খুলে বসে আছে। পায়ের ভিতর থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক অন্ধকারের আরো একটু বেশি ডিস্প্লে। বন্ধনের রেশমি মর্মর নিয়ে যাচ্ছে কোন এক অমামুক্তির ফাটলে। ওই ফাঁক দিয়েই তো বাঁক সারিবদ্ধ নাবিকের সবুজ রুমাল। সবুজ স্পর্শের আকুলতা আমাকে ক্রমশ ফিকে বাদামী করে তুলছে।

কুঁকড়ে যাচ্ছি

স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি ফ্যাকাসে ও মায়ায়

প্রচ্ছদ মুছে ফেললাম

শামুক আঁকছি
ঢুকে যাচ্ছি খোলসের আড়াল

গড়িয়ে পড়ছি পাহাড় থেকে
পায়া ও পেরেকে

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে এক আহত আলোর নিচে মুষড়ে পড়ে যাই। জর্জরিত ভরাটের দিকে তাকিয়ে দেখি সময়সীমা অতিক্রম করে গেছি।

গোড়ালির তৎপরতায় ইউরিক অ্যাসিড
প্রবল ঢেউয়ের সমাহার
ক্যালসিয়ামমুখী হয়ে রক্তের আষাঢ় কাল
হে পায়ের প্রবাল

সময় যেন থমকে দাঁড়ায়। আমি জিজ্ঞাসার মুখে অস্ত্র ছুঁড়তে থাকি। সে আমাকে ঘড়ি দেখায়। বনবন ঘুরতে থাকি দ্রুতলয়ে। চতুর্দিকে চতুর ঘড়িরা ঘুরতে থাকে। সাদা- নীল- কালো সেগুলোর জমি। ঘড়ির ঘরে দুটো কালো পা। একটি ঘণ্টার আর অপরটি মিনিটের। পা প্রতিস্থাপিত হয়েছে কাঁটায়। ঘুরছে পা দুটো কাঁটা হয়ে। আমি কাঁটা হয়ে থাকি। ভয়ে ! ! !

স্বকাব্যকথন

আমার জ্যামিতি
অভিজিৎ মিত্র

জ্যামিতি কি ? জ্যামিতি হল গণিতের সেই শাখা যা বিন্দু, রেখা (সোজা বা বাঁকা), তল বা বহুতল বস্তু নিয়ে চর্চা করে। বিভিন্ন বস্তুর মাপ শেখায়। দৈর্ঘ্য প্রস্থ আয়তন, সবকিছু। একের সঙ্গে অপরের সমতুল্যতা প্রমাণ করে। সম্পাদ্য উপপাদ্যর মাধ্যমে। এমনকি এই মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের চলাচল, কে কত বড় ছোট, সব জ্যামিতির দৌলতেই। জিও মানে পৃথিবী আর মেট্রন মানে মাপ, ফলে জিওমেট্রি শব্দের মূলে রয়েছে পৃথিবীর মাপ, পার্থিব বস্তুর মাপ।

এখানে একটা সুন্দর খেলা লুকিয়ে থাকে। কারণ প্রত্যেক বস্তুর ভেতর বা লাইনের ওপরে- নিচে বা বিন্দুর আশেপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা বা স্পেস জমে থাকে। আমরা চাইলেও থাকে, না চাইলেও। একের সঙ্গে অন্যের ফাঁক তৈরি করে। ইউক্লিড যখন শুরু করেছিলেন তখন উনি এই স্পেস নিয়ে তত আমল দেন নি। এমনকি পিথাগোরাস আর্কিমিডিস- ও দেননি। কিন্তু আজকের জ্যামিতিতে স্পেস খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে জ্যামিতির স্পেস, পার্থিব স্পেস, বিমূর্ত স্পেস সবকিছু সেখানে মিলেমিশে একাকার। সেখানে রাইম্যান, আইনস্টাইন, এদের ভাবনা গুরুত্ব পায়। প্রত্যেক সম্পর্কে স্পেস চলে আসে। কেন্ট খুব দামি একটা

কথা লেখেন – মাত্র একটাই জ্যামিতি আছে যেটা সত্যি আর সেই জ্যামিতি প্রথমে বুঝতে হয় চেতনার সাহায্যে। তখন 'আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ' সত্যি হয়ে যায়।

তাহলে সেই স্পেস, সেই জ্যামিতি মানুষের জীবনের মানুষের ভাবনার আনাচ- কানাচ ছুঁয়ে যায় – সবসময় – কোন না কোন ভাবে। কবির কল্পনায় তার রং হয়ত একটু অন্য, একটু ট্যারাবাঁকা, অনেকটা স্ট্রিং থিয়োরির মত, কিন্তু সেখান থেকেই শুরু হয় আমার জ্যামিতি বা স্পেস কবিতার সেন/ইনসেন চিন্তা ভাবনাগুলো। কবিতায় থিয়োরির কোন কচকচি থাকে না, শুধু একটা চেষ্টা থাকে – বিমূর্ত সম্পাদ্য উপপাদ্যর মধ্যে দিয়ে সম্পর্কগুলো বা ভাবনাগুলো পাশাপাশি এনে ফেলার অথবা অদ্ভুত একটা স্পেস তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে নতুন মাত্রায় সেগুলো নতুনভাবে দেখার।

এই ধরণের জ্যামিতি কবিতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছি। কোথায়- কোথায় কতগুলো, সেসব এখন মনে নেই। কিন্তু সেই সবগুলো ঘেঁটে এনে ছড়িয়ে ফেলতে যে স্পেস লাগবে, তা এখন এই অল্পকথায় আঁটবে না। সেজন্য আজ একটাই কবিতা নিয়ে বলব – কৌরব ১০৫ (ফেব্রুয়ারি ২০০৮) সংখ্যায় লেখা আমার কবিতা সিরিজের ৫ নম্বর কবিতা। পাঠকের কাছে অনুরোধ, কৌরব ১০৫ হাতের কাছে পেলে আমার সেই কবিতা সিরিজটা একবার চেখে নেবেন কারণ ওটা পুরো সিরিজটাই জ্যামিতি কবিতা। যাইহোক, কবিতাটা এই রকমঃ

উপপাদ্যঃ যে মাথায় সম্ভাবনার জ্যামিতি নেই, তাকে আমরা পান্তুয়া বলি।
প্রমাণঃ 'রাতকলি এক খোয়াবো মেঁ আয়ি' গুনগুন করতে করতে ময়রাবাড়িতে ঢুকে পড়ি। উনুনের ওপর জাল দেওয়া দুধের কড়ায় এখানে সেন্ট্রিপিটাল আর সেক্সুয়াল, দুটো ফোর্সের শাসন একসঙ্গে। দুটো ত্রিভুজকে মাথায় মাথায় জুড়ে ৩৬- ২৪- ৩৬ বানিয়ে ওদের একটু নাড়িয়ে দিলে যেরকম হয়। ওদের মাঝে কমন চতুর্ভূজের ক্ষেত্রফল ময়রাও বলে দিতে পারে। এসময় মাথার ভেতর সবাই নড়ছে তৈরি হবে গসিয়ান পাহাড়। উঠব উঠবনা করেও হাঁটা লাগাই সঙ্গে সঙ্গে ময়রা খালি দুহাতে তখনো খুন্তি নাড়ার মোশন। পাহাড়ের প্রথম ধাপে পা দিয়েও শুনছি ওর মাথায় আজ রাতে কড়াভর্তি পান্তুয়ার ছবি। ও কি নিউটনের তিন নম্বর সূত্র ধরে এবার রোবট হয়ে যাবে? পান্তুয়াকে পোলার স্কেলে মাপার ডিশে তুলে ধরি। 'টেস্ট করো, আজ পান্তুয়া স্পেশাল' ময়রার চোখদুটো জ্বলে ওঠে। আর ত্রিভুজদুটো নড়ে ময়রাবাড়ির মেজো মেয়ে ৩৬- ২৪- ৩৬ 'তোমার কি আমাকে মিষ্টি লাগে না?' বলে সিঁড়িবেয়ে আড়চোখে ইশারা রাখে। ঐ সিঁড়ির এন গুন এক্স প্লাস ওয়াই জ্যামিতি ধরে মাথার ভেতর অঙ্ক তৈরি হচ্ছে। এসময় কি পান্তুয়া খাওয়া যায়?

কবিতাটা আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ। ময়রার কড়াইতে পান্তুয়া তৈরি হচ্ছে। প্রতিদিন ঐ এক জিনিস বানাতে বানাতে ময়রা অনেকটা রোবট টাইপ হয়ে গেছে। এর মাঝে খানিকটা অঙ্ক, কিছু মাপজোকের কথা বলা আছে, আর, একটু শারীরিক আভাষ আছে। একবার পড়ে খানিক আমেজ পেয়ে একপাশে সরিয়ে রেখে দেবার মত কবিতা। এবার এটার ভেতরে ঢুকে কাটাছেঁড়া করা যাক।

সম্ভাবনা – পসিবিলিটি – সৃষ্টি – ক্রিয়েশন। পান্তুয়া একটা থলথলে কালো জিনিষ যেটাকে ব্ল্যাক হোল হিসেবে ধরা হয়েছে। ব্ল্যাক হোল মহাবিশ্বের এমন এক বস্তু যা শুধু এনার্জি শুষে নেয়, এনার্জি দেয় না। তাহলে? উপপাদ্যের মানে হল, যে ব্যক্তি সৃষ্টিশীল নন, তিনি শুধু এনার্জি শুষে নেন, দিতে পারেন না। আরেকটু এগিয়ে – সৃষ্টি মানেই যে গল্প- কবিতা- গান- নাটক- নাচ- বাদ্যযন্ত্র হতে হবে, তা নয়, নিজের নিজের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল হলেই হল। একজন ব্যাঙ্কার

প্রথাগত পন্থা এড়িয়ে একটু অন্যভাবে টাকার লেনদেন ভাবতেই পারে, একজন সিভিল লেবার রাস্তা তৈরির সময় প্রথাগত মালমশলার মিশ্রণ এড়িয়ে অন্য পদ্ধতিতে ব্যাপারটা দেখতেই পারে – এবং এরাও সৃষ্টিশীল। কিন্তু যারা গতানুগতিকতায় আটকে গেছে, তারা সমাজের জন্য বিপজ্জনক। এরা বিভিন্ন কুসংস্কার লোকাচার মানার জন্য এবং এদের আশেপাশে সবাইকে মানানোর জন্য এতই ব্যাকুল হয়ে থাকে যে সমাজের নতুন কোন এনার্জি লাভ হয় না, বরং এদের মণ্ডলে প্রচুর এনার্জি ক্ষয়ে যায়, সমাজ সামনে এগোবার বদলে পেছিয়ে যায়। এটাই উপপাদ্য বিষয় এবং এটাই প্রমাণ করা হয়েছে। তার জন্য ময়রাবাড়ির কড়াইতে পান্তুয়া তৈরির রূপক টেনে আনা হয়েছে।

আমি একজন মানুষকে প্রতিদিন রাত বারোটায় যদি আমার সঙ্গে ফুটবল খেলতে বাধ্য করি, তাহলে কয়েক বছর পর ঐ সময় সে কোন একদিন ঘুমিয়ে পড়লেও তার পা নড়তে থাকবে – প্রতিবর্ত ক্রিয়া। সে অনেকটা রোবটে পরিণত হবে। এখানে ময়রাও তাই। এক জিনিস রোজ করতে করতে সে নিজে সমাজের ব্ল্যাক হোল হয়ে গেছে। সে নিজেকে আর প্রশ্ন করে না – এটা ভালো না খারাপ? সে কেন এটা করছে? সে কি এটা একটু অন্যভাবে করতে পারত না? বরং সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও খুন্তি নাড়ে। ময়রা বাড়ির মেয়ে এই গতানুগতিকতার বাইরে একটা স্পেস, একটা ডাইমেনশন তৈরি করেছে। তার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়া আর পুরুষকে আহ্বানের ভেতরেও একটা সৃষ্টিশীলতা। মুখে না বলেও ইশারায় এসোর আহ্বান নতুন করে ভাবতে বাধ্য করায়। তখন পাঠক সামনে বেশ কিছু সম্ভাবনা দেখতে পায়, তার মাথায় পরস্পরবিরোধী কিছু চিন্তা আসে। দুটো ত্রিভুজ, একটা আরেকটার ওপর ঘুরতে থাকলে যেরকম হয়, অনেকটা সেরকম। একটা স্পেস দাঁড়ায়, প্রশ্ন করে – আরেকটা স্পেস চলতে থাকে। রিলেটিভিটি। মাথায় বীজগণিতের অজানাগুলো ভীড় করে। সে আরো সম্ভাবনা খুঁজে পায়। সমাজ ও পৃথিবীকে অন্য কোণ থেকে বুঝতে চেষ্টা করে। একটা মেয়েকে, সমাজকে, কতটা স্পেস দেওয়া উচিৎ কতটা জড়িয়ে ধরা উচিৎ, সে বুঝতে চেষ্টা করে। খেলা চলতে থাকে, যে খেলা উস্কে দিয়ে গেছে গতানুগতিকতার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ময়রাবাড়ির মেজো মেয়ে। এ সময় কি পান্তুয়া খাওয়া যায়? নিশ্চয়ই না।

ব্যস্, আমার উপপাদ্য প্রমাণিত।

বাকিটা? ওটা কবির খেয়াল, সেটার কোন মানে নেই। পান্তুয়া কেন? ওটাও কবির খেয়াল। ব্যক্তিগতভাবে পান্তুয়া জিনিষটা পছন্দ করি, তাই ওটাই ব্যবহার করলাম। ওটার একটা স্ল্যাং ব্যবহারও হয় – সেটা নাহয় নাই বা বললাম।

কাব্যনালিসিস

যে জায়গাটা কোথাও নেই
রমিত দে

পিকাসো যেমন ছবি আঁকতে গিয়ে বলতেন –"গোটা মানুষটা আমার ছবির মধ্যে থাকে"- কবিতা কিন্তু মোটেই তেমনটা নয়, কবির সাথে সাথে সেও সারাক্ষণ ছুটে বেড়াচ্ছে আর ভেতরের কুরে কুরে খাওয়া বর্ণমালা কুড়িয়ে বাড়িয়ে ভাঙা আয়নার সামনে জড়ো করছে। আমরা ভাবছি সে হয়ত একটা আস্ত মানুষ বানাতে চাইছে, অথচ না, আসলে সে কিছুতেই গোটা মানুষটাকে পেতে চাইছে না। আয়ুর মধ্যে ঝিকিয়ে থাকা এমনই এক অস্থিরতার মাঝে নিদ্রাহীন জেগে রয়েছেন কবি। কিন্তু কোথায় যেতে চাইছেন? তার কবিতাদের নিয়ে তার ক্রাইসিসদের নিয়ে তার স্বপ্নদের নিয়ে তার সংকট আর স্তব্ধলোকেদের নিয়ে ! এলিমিনেশন এলিমিনেশন এলিমিনেশন...টুকরো করতে করতে প্রত্যাখান করতে করতে তার নিজেরই পায়ের ওঠানামাকে অস্বীকার করতে করতে তার সে যাওয়ার জায়গাটা আসলে কোথায়? সে কোন বনরাজিনীলা! সে কোন ভূমিরন্ধ্র কিংবা ঘনগভীর বনপথ !

"আসলে, এটা এমন একটা জায়গা
যে জায়গাটা কোথাও নেই –
আসলে,
এটা সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক একটা জায়গা
আসলে, যা লিখতে চেয়েছি আর যা লিখেছি-
এরই মাঝামাঝি এটা এমন একটা জায়গা
যেখানে একজন কবি, শেষপর্যন্ত পৌঁছবার স্বপ্ন দেখেন . . . " (সুমিতেশ সরকার/ যে জায়গাটা কোথাও নেই)

আসলে কবিতা একধরনের কানাগলি যার কোনো জেনোটিপিক্যাল স্থিরতা থাকা সম্ভবপর নয়, শব্দের কঙ্কালটির ভেতর যে অনবরত মিউটেশন সেখানে কোনোমতেই একটি অমোঘ অঞ্চল চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। সুমিতেশ সরকারের এই হ্রস্ব কবিতাটার কাছে এলে আর তার অক্ষরের জ্যান্ত শরীরটাকে ছুঁলেই বোঝা যাবে কবিতা আসলে একজন কবির কাছে কেবল মাথা গোঁজবার ঠাঁই নয় বরং এক ধরণের মোমেন্টাম অফ কনফ্লিকশন। কিন্তু চেতনার চেনা উঠোনে এমন এক চাপা অচেনাকে উপুড় করে রাখলেন কেন কবি? ঠিক এ জায়গা থেকেই কবিতাটা হয়ে ওঠে আরও উপভোগ্য ও আরও প্রশ্নলীন। প্রশ্ন উঠতেই পারে কবিতাটিতে কি কেবল একজন কবির পায়ের ওঠানামাই লক্ষিত হয় নাকি তার আশেপাশে পরিলক্ষিত হয়ে উঠছে একাধিক অস্পষ্ট আসা যাওয়া ! আসলে এমন একটা সহজ মেদহীন কবিতায় লুকিয়ে রয়েছে দ্বিমুখীস্রোতের মত একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অপর একটি উদ্দেশ্যহীন শান্ত উচ্চারণ। আর এই দুইয়ের বিরল অভিঘাতই কাব্যিক ন্যারেটিভে প্রবেশ করিয়েছে একধরণের ইমোশনাল ট্রানজিশন। আর কবিতা হয়ে উঠেছে সেই বিরামহীন সাঁতার যার খাঁজে খাঁজে লেজ নাড়াচ্ছে কবি নামের চির ভবঘুরে কিংবা এক অভিজাত ভ্রমণার্থী। কিন্তু কবি কি এই ক্রম অভিসারে একটা কনটিন্যুটি চাইছেন? একটা যাওয়া যা কোথাও নেই অথচ একটা যাওয়া যার দিকে পা ফেলা আছে – একটা অনুসরণ যেখানে শূন্যতার সন্ধ্যামালতী নুয়ে পড়ে ফিসফিস করছে অথচ তার

দিকেই ঢ্যাঙা হয়ে উঠছে শুরুশেষহীন একটা অভীপ্সা। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে কবিতাটির মধ্যে দিয়ে সুমিতেশ কি একটা ধীর প্রসেসের মধ্যে দিয়ে পরিণামবাদে পৌঁছোতে চাইছেন আদৌ? নাকি আদতে তার আণবিক মনের মাঝখানটা একদম ফাঁকা, সেখানে শেষ অবধি কোনো অরগানিক ইউনিটি নেই অবয়ববাদ নেই । আসলে এই নেই- টাই নিজের থাকাকে প্রশ্ন করছে বারবার। এই নেই টাই সেই কাল্পনিক জায়গার দিকে কবিকে ঠেলে দিচ্ছে বারবার।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় কবিতা একধরণের দৃশ্যশিল্প, সিনেমায় যেমন আলো কম বা আলো বেশি অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ আলোর মাত্রার উপর নির্ভর করে চিত্রনাট্যের কারেক্ট এক্সপোজার হয় ঠিক তেমনি কবিতাতেও আলোর কিছু ডিটেল থাকে, এই আলো আঁধারি কিন্তু চোখের থেকেও অনেক বেশিমাত্রায় মনের, মতির, অস্তির ভেতর গুটিয়ে আনা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম সেইসব অণুভাবনার। অর্থাৎ একটা কবিতার ক্ষেত্রেও টোন রিপ্রোডাকশনের একটা ব্যাপার থেকে যায়। ফোটোমিতির মূলেই যেমন প্রতিফলন একটি বিশেষ কারক হয়ে ওঠে কারণ আলোকচিত্র তো বস্তু নয় বরং বস্তুর বিম্বই সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য, ঠিক তেমনি কবিতাও কোথাও কথা নয় বরং কথার বিম্বতাই শব্দের বিশ্বাসযোগ্যতাকে অতিক্রম করে শব্দকে নিয়ে চলে সৃজনের মিথস্ক্রিয়ায়। সুমিতেশের উপোরোক্ত কবিতায় নিঃসন্দেহে আমরা এমনই কিছু মুড ফোটোগ্রাফি দেখতে পাই। সিনেমার মত আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে কোনো অপারেটিভ ক্যামেরাম্যান নেননি কবি বরং নিজেই ঝাঁপ দিয়েছেন ভিশনের মাঝে। আর অদ্ভুতভাবে কবিতার কথাগুলির আভাসে ভেসে উঠছে আলো থেকে আলোকায়ণের এক নতুন সংকেত। কীভাবে? আসলে চেতনার দু ধরণের লাইটিং ব্যাবহার করেছেন এখানে সুমিতেশ। ফ্লেয়ার লাইটিং এবং শিলিউট লাইটিং। চরিত্রের প্রান্ত জুড়ে আলোর দ্যুতি সৃষ্টি করাই ফ্লেয়ার লাইটিংয়ের কাজ যেখানে শিলিউট লাইটিং বিষয়বস্তুর পেছন দিকটা আলোকিত করে বিষয়বস্তুর কালো আকৃতি সৃষ্টি করে। উপরের কবিতায় কবি ‘‘যা লিখতে চেয়েছি’’ এবং ‘‘যা লিখেছি’’ এই শব্দবন্ধদুটির ওপর সরাসরি আলো ফেলেছেন, প্রকাশিত করে তুলেছেন বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন বাস্তবের ক্ষেত্রগভীরতাটিকে অথচ এর পরের লাইনের ‘‘এরই মাঝামাঝি এটা এমন একটা জায়গা’’ র সাথে তিনি ‘‘যে জায়গাটা কোথাও নেই’’ এর মত একটি ডিমার এফেক্ট দিয়ে একধরণের ছায়া তৈরী করলেন যা দৃশ্যচ্যুত অথচ দৃশ্যাতীত। এখানেই একজন কবিকে আমরা ধীরে ধীরে শব্দের বিকাশ ও ব্যঞ্জনা থেকে পা বাড়াতে দেখি বিমূর্তের রঙে। কিন্তু কেবল কবি কেন? আমরাও কি এমন একটা জায়গার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি না? তৃষিত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে? কেবল একজন শব্দশিল্পীর কেন, কবিতার পার্থিব ভিত্তিতে যে অপার্থিব উৎপ্রেক্ষাটি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে তেমনি কোনো এক শূন্য পরিভ্রমণে কি আমাদেরও পায় না? যাপনের ঠান্ডা সাদা আলোয় ঠায় দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমাদেরও কি মনে হয় না কনট্রাস্টটা, শিখাটা একটু কমিয়ে দিয়ে দেখি ছায়াটা কোথা থেকে আসছে, এই সামান্য নীড় সামান্য নিবেদন ছুঁয়ে আর্তনাদ রেখে কোথায় বা ফিরে যাচ্ছে আলো, কোন আনন্দের দিকে ! মাঝে মাঝে ভাবি এই যে স্বপ্ন দেখি সে তো জেগে থাকার জন্যই, প্রতিটা ঘুম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই, কবিও কি কবিতার মধ্যে দিয়ে আসলে মনকে বিশ্রাম অবধি পৌঁছে দিতে চান? যেখানে তিনি মতি কে খুঁজে নেবেন ! মেঘ ভরে আছে কবির ডানায়? যা কিনা মায়াবাদ ছেড়ে মাংস ও মূকাভিনয় ছেড়ে নিয়ে যাবে সব কিছুর বাইরে সেই বয়সহীন শূন্যবাদে! অথচ কবি নিজেই শেষ পংক্তিতে স্বপ্ন দেখার মধ্যে দিয়ে একধরণের ছটফটানি রেখে গেলেন। আন্তঃপাংক্তেয় এই প্যারাডক্সিকাল ট্রিটমেন্টটাই বোধহয় কবিতা। যেখানে একই সাথে অপেক্ষা ও আত্মসমর্পণের আকুলিবিকুলি দেখতে পাচ্ছি আমরা। আশ্চর্যভাবে এধরণের দ্বান্দ্বিক সরগমে তো কেবল একজন কবি কেন? একজনআম পাঠকও কবিতার সাথে সাথে শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় পৌঁছতে চান যা আসলে সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক একটা জায়গা, শেষমেশ যা আসলে মুর্হুত থেকে আন্তরমুর্হুতে যাওয়ার দ্বান্দ্বিক সূত্রে নিয়ন্ত্রিত একটি সিন্থেথিস।

সুমিতেশ কবিতার সারাশরীরে একধরনের খিদে খিদে ভাব রেখে দিয়েছেন, চোখের সামনে ঘুরিয়ে মেরেছেন চোখের বাইরের সেই সিঁড়িটাকে। আসলে একজন কবি ক্রমাগত আন্ডারএক্সপোজ করতে থাকেন তার চেতনার প্রতিটি সচেতন ফ্রেমকে যারা ধীরে ধীরে কবিতার সার্বিক ফ্রেমটির স্থিরতা

ভেঙে দিয়ে ফ্রেমটির মধ্যে একধরনের বিভ্রম সৃষ্টি করে একধরনের অতিরিক্ত বিবশতা আর এই অন্তহীন বিভ্রমই তো কবিতা, যা বোধের এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীর দিকে চলে যায়। আবহমানের ধ্বনির ভেতর বেজে ওঠে নতুন কোনো আলিঙ্গনের কথা। কবি পৌঁছোতে চান এমন একটা জায়গায় যে জায়গা নেই, যে পৌঁছোনো নেই, কেবল যাওয়ার ছটফটানিটুকু আছে। এই ছটফটানিটুকু হাহাকারটুকুই তো কবিতা। কিছুদিন আগেই সন্তোষ সেনের একটা লেখায় পড়ছিলাম দিনকর কৌশিকের ওপর তাঁর করা তথ্যচিত্রের তৈরীর কিছু মুর্হুতের কথা, যেখানে দিনকর কৌশিক জানাচ্ছেন ১৯৪২ সালে ওঁরা যখন অজন্তা ইলোরা ভ্রমণে গিয়েছিলেন, উনি সত্যজিৎ রায়, পৃথ্বীশ নিয়োগী অজন্তার গুহাচিত্র দেখতেন। গুহার ভেতরে তো অন্ধকার। গুহার বাইরের সুর্যের আলো সাদা কাপড়ে প্রতিফলন করে গুহার ভেতরে ঢুকিয়ে তারা ওই সব চিত্র দেখতেন। সুমিতেশ সরকারের ‘‘যে জায়গাটা কোথাও নেই’’ কবিতা পড়তে পড়তে মনে হল প্রতিটা শব্দের ভেতরের অন্ধকারে তিনিও যেন এমনই একটা স্বপ্ন নামের সাদা কাপড় ফেলে আলোর প্রতিফলন করাচ্ছেন চেতনার বিগ ক্লোজ আপটি দেখার তাগিদে।

কেবল তাই নয় সমস্ত কবিতায় ‘‘স্পেস’’কেও একধরণের সিম্বলিক সিমুলেশন দেওয়া হয়েছে। প্রতি মুর্হুতে যে প্রস্তুতির ভাব প্রতি মুর্হুতেই যে পায়ের ধ্বনি সেখানেই প্রতি মুর্হুতেই কিন্তু ফিরে আসাও আছে। ‘‘জায়গা’’ শব্দটির মধ্যে দিয়ে কবি তো কেবল স্থান বোঝাননি বরং তার সাথে অলক্ষ্যে জুড়ে দিয়েছেন একজন মানুষের আনন্দ মত্ততা স্থিরতা স্পন্দন এমনতর একাধিক কথা। জুড়ে দিয়েছেন একজন স্রষ্টার জগত মন্ত্র চেতনার নাদ ও ঝঙ্কারকে। একই শব্দ একদিকে যেমন তাকে শান্ত মাটির সাথে প্রাত্যহিক করে রেখেছে অন্যদিকে সেই ‘জায়গা’ শব্দটিই শূন্যতার বিন্দু হয়ে অনুক্ত চেতনাকে বিবৃত করছে। এ যেন সেই মৃত্যু শব্দটির মতই বহুধার বিস্তার দিচ্ছে। মৃত্যুর মূলে যে ‘মৃ’ ধাতু তা কেবল জড় হয়ে যাওয়া অর্থেই নয় বরং এই ‘মৃ’ ধাতু সেই মরুৎ বা মর্মর অর্থ থেকে এসেছে যার অর্থ আলোয় ঝলমল করে ওঠা। অর্থাৎ মৃত্যুর মাঝে যেমন একদিকে কোনো ঘোষণা নেই, ঠিক তেমনি সমান্তরালে একটি স্পষ্ট ঘোষণাও যেন কোথাও রয়ে গেছে আরো স্পষ্ট হয়ে। একইভাবে কবি নিজেই কবির আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কন্ঠনালীর কাছে এসেও স্বপ্ন দেখছেন কল্পনার সেই অভীপ্সিত এলাকাগুলিতে পৌঁছোনোর, একইসাথে যে জায়গাটা কোথাও নেই যে জায়গাটা জড় সেই জায়গাতেই কবির হৃদয়দ্রাবী আলোর আতিথেয়তা। অথচ কবিতার শুরু থেকে শেষ অবধি প্রশ্নের কোনো সুরম্য মীমাংসা চাননি কবি নিজেই বরং নিজের প্রশ্নের ভেতরই ঘুরে বেড়িয়েছেন। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছেন সত্তার ভাঁজে অথচ সাথে সাথেই স্নায়ব সংবেদন তাকে ঠেলা দিয়েছে অর্মত্য গহনের দিকে। এই আপাতবিরোধের মজাটাই কবিতা। এই ‘নশ্বরতার টানাপোড়েন’ই যে কবিতা। এখানেই তো একজন কবি ভরাট ভবচক্রে দাঁড়িয়েও খুঁজে ফেরেন শূন্য ঠাম। এই এক অবিভাজ্য জায়গার জন্যই তো তার আর্তি, আকুতি। পাশাপাশি এমনই এক মাদল বাজছে প্রতিটা মানুষের মধ্যেও, মন কেড়ে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে মন থেকে। সরু এই কবিতার ভাঁজে ভাঁজে সুমিতেশ একজন কবিকেই কেবল প্রশ্রয় দিয়ে যাননি, নিজেকে প্রশ্ন করার সাথে সাথে আপাত সরল পাঠকটিকেও হয়ত ভাবিয়েছেন - দেখুন না হয়ত আপনারও একটা দাওয়াওয়ালা মাটির ঘর আছে, গুটিকয় লতাপাতা গুটিকয় তালগাছ আছে, কয়েকটি নৌকা কিছুটা তটরেখা- তবু কি আপনি নিশ্চিত জানেন ঠিক কি আছে আপনার? ঠিক কোনটা আপনার ঠিকানা! কোনটা গন্তব্য? শেষ পর্যন্ত আপনিও হয়ত ভাবছেন রাস্তা ঠিক আছে তবু রাস্তাটা কোথাও নেই, শেষপর্যন্ত হয়ত ধীর লয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে আপনিও পৌঁছবার স্বপ্ন দেখছেন ! কে জানে ! . . .

hasten on your childhood to the hour when white in memory blue borders white in its eyes very white and piece of indigo of silver the glances white cross cobalt the white paper that blue ink tears bluish away ultramarine descends that white may rest troubled blue in dark green wall green that writes its pleasure rain green clear that swims green yellow in the clear oblivion at the edge of its green foot the sand earth song sand of the earth afternoon sand earth in the comer a violet jug the bells the folds of paper a metal sheep life stretching out the paper a rifle shot the paper rings the canaries in the shade white almost pink a river in the -white space in the clear blue shade of colours lilac a hand at the edge of the shade makes of the shade in the hand a very rose-coloured grasshopper a root lifts its head a nail the block of the trees with nothing else a fish a nest the heat in full light looks at a sunshade light the fingers in the light the white of the paper the sun light in the white cuts out a sparkling eyeshade the sun's light the very white sun the intensely white sun

বীরেন ডঙ্গওয়াল- এর কবিতা

ও নগপতি মেরে বিশাল

(মূল হিন্দি থেকে ভাষান্তর : দীপঙ্কর দত্ত)

হে আমার বিশালকায় পর্বতরাজ

কত রাত দুচোখে জ্বলুনি নিয়ে কেটে গেছে
বৃষ্টিহীন কাটিয়েছি কত দিন
হাসপাতালের পূতিগন্ধময় বিছানায় পড়ে থেকেছে
কবিতার মনুষ্য শরীর

আমি ক্রুদ্ধ হই কিন্তু নিজেকে নষ্ট করি না
জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে কবিতায় কাঁদতে পারি না
ব্যথিত হই
তো এই কান্নাহীন দুঃখ
ভেতরে দংশায়

তুমি কতদিন এভাবে দিল্লীর কবলে থাকবে ?
এদিকে আমি হঠাৎই নিজের ভেতরের দিল্লীটাকে বদলাতে শুরু করেছি
মাথা নীচু করে স্বীকার করছি
যে, ওই নির্মম শহর প্রত্যেকবার তোমাকে বাঁচিয়ে এসেছে
যে কারণে আজও আমি তোমাকে দেখতে পাই

আমি তোমাকে দেখি
যেমন শিবালিকের মানুষ হিমালয়কে দেখে
কিছুটা সংকোচ কিছুটা গর্বের সঙ্গে

হে আমার বিশালকায় পর্বতরাজ
আমারও জীবনের, কবিতার যাত্রাপথ কণ্টকময়
পূর্বপুরুষের স্মৃতি অহরহ খায় কুরে কুরে
দ্যাখো, দু- তিনটে ময়লা ঝুলিতে কেমন গুছিয়ে নিয়েছি সমস্ত তল্লিতল্লা

এখন আমিও লুকিয়ে দিল্লীতে আসি
কিছু নির্দয় অট্টালিকাকে জখম দেখিয়ে
ফিরে যাই অবিলম্বে

আমরা এরকম ছিলাম না কখনো
আর এমনটা না হওয়া ছিল তোমারি মন্ত্রণায়
যে, শুধুই কবিতা টেনে নিয়ে যায় না
নিয়ে যেতেই পারে না আমাদের দিল্লীতে
জখমই নিয়ে যায়

হে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
বছরের পর বছর যে স্থানে আমরা নজরেই এলাম না
এ কেমন অসহায়তা
যে, আমরা সেখানেই আমাদের জখম দেখিয়ে বেড়াই

বারীন ঘোষাল- এর কবিতা

বারীনের রান্না আর বান্না

স্ক্যাভেঞ্জারের ব্যাগ

ভাবলে বেড়ানো না ভাবলে ছন্নছাড়া ভ্রমনের ভ্রু দ্যাখ বে অ্যাই শালা চোখ সারি দিয়া বাসের লাইন আই মে মেয়ে পাখি কি সব মনে পড়ছে বৃষ্টিপোকা হয়ে একদিক দিয়ে আর অন্য দিক দিয়ে বেইরে যাচ্ছে বাজারটা সারলে হয়

পুং স্যাম্পেল মাদি মাদি ছবি ছেঁড়া ছেঁড়া
বিয়ার বিয়া নাকি ভ্রুণটগরে রান্না সুরা দর্শক

ধানের অভিধান কেন যে কে যে

রাইটার
তারপর পটলের দোকানে পটল চেরা পটল বাছা পটল তোলা এতক্ষণে পায়ে টল মল পড়েছে
বর্ষায় যে ঝাপসা বাবু হতাশার তাস খেলছে উহারা অরুণ চক্কোত্তির ফোড়নটা ইস
মাইল মেশানো ট্রেকিং পাতোল পাতোল গান ক্লোরোফিল
শব
শ শ শ শমাংস গন্ধ জল গুণ রেলারির বীজ পটলের ডাল না না না না বলতে ভাল লাগে রে
দূর শালা ব্যাগ ভরছে না তবু সর বে সরে যা

ঝুটা তো ঝুটাই ফ্রেম

চুরি যাক গে

বাজার সেরে বাড়ি ফিরে ব্যাগ উল্টে দিলে বৌ মুখ ঝামটা দিলো খাইসে কিয়ের রান্না অইবো অখনে খামু কিকিকি - - - গ্যাপ - - - ঝামটা দিলেও রান্নাঘর থেকে খুশবু বু বু বু বু বুবু হয়ে যায়। রান্না শেষে মাল দাঁড়ালো এমন এক মন। সেই যে আমি জগাখিচুড়ি রান্না শিখিয়েছিলাম তাকে, ৫/৬ টা সবজি ছোট করে কেটে, চাল ডাল আলু পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে নুন হলুদ, আর আর, মাংস ছোট ছোট করে কেটে একসঙ্গে প্রেসার কুকারে জল দিয়ে ৫টা সিটি, ব্যাস মাল তৈয়ার, লোকে চেটে পুটে খেতো, সেরকমই, পুরো বাজারটা কেটে কুটে মশলাপাতি দিয়ে কুকারে, জরায়ুতে, অ্যান্ড মাইন্ড ইট, নো আউলিপো প্লিজ, নিজের বেবিকে সবাই সুন্দর দ্যাখে, অর্কবাবু খেতে বসবেন, সিডনী থেকে এয়েচেন, আসুন বাবু, আমি পরিবেশন করি ঘ্যাঁটটা, না না, জগাখিচুড়িটা ... ... চলুন স্যার . . . . . .

আই যাই চোখ
আইবুড়ি
শাড়ি নয় সারি
গাছের মেয়েরা পল পল করছে পুংপরাগে
বোস পাখিদের এখন পাখি বসু বলতে ইচ্ছে করছে যে
অভিধানের বাইরোপন ধান এবারের মতো গান বেঁধেছে মাঠে
উলুবনে শব্দবিয়ার স্যাম্পেল দেখবে চলো

এ তবে কাহার বিয়ার আগে কার ভ্রূণ খুলেছি আমি
ভোরুণ বাতাসে যে টগরতলায় সাজি ফেলে রাঁধতে যাবে
দাঁড়ে বসে ডাকবে ওই মা
রান্নার বই ঝাপসা হলে পাল্টে নেবে ফোড়ন

লম্বা ট্রেকিং- এর বুড়িদাগ কেবলই সরে সরে যায়
হতাশার যে তাসে রেললয় ধরে তান
আর আমরা দর্শকের
এই হাস আমি কোন ঠোঁটে আঁকি পটিয়সী
এই চাপা গুন চাপা গুন সুরের সুরা ঢালবেটা কে

ইসমাইল
ম্যান
ওই রাস্তা পেরোয় পায়ের তলায় অচেনা পলল
সেই ভঙ্গী ফ্রেমের
ফ্রেমাংসের
বীজের সবুজে
ক্লোরোফিল ফিল করা শবরা আর দ'য়ে পড়ছে না তো

কেমন লাগলো স্যার ? হ্যাঁ ? না ? যাস্‌সালা . . . . . .

রবীন্দ্র গুহ- র কবিতা

রূপবান উলঙ্গ পুরুষ

যখনই মোমবাতির শিখাটা পেশী ছুঁয়ে যাচ্ছিল ভেঙ্গে যাচ্ছিল গোপনগরাদ
স্বপ্নের আয়না, আর
কেঁপে- কেঁপে উঠছিল শরীরের শিরাগুলি — বসন্তের গন্ধ উদভ্রান্ত
লোকটি এমনই বীর্যশালী স্বতস্ফূর্ত, যেকোন স্বপ্ন কল্পনা করতে পারত
সুন্দরীরা তাকে অলীক আশ্চর্য পুরুষ ভাবত, বলত :
— হ্যাঁ কখনই তুমি পশুর অভিনয় কোরনা
পুনর্জন্ম হলে আমি তোমার নিজস্ব ভাষার সঙ্গিনী হব হেতুবর্জিত
বৃক্ষের মাথায় পতাকা তুলব ধৌত মেঘ ছুঁয়ে, হে প্রভু
তুঁতবনে বেড়াতে যাব স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে, অন্যথায় দুঃখ, উঁহু, দুঃখের অধিক প্রিয়
নিজের নিজের চিতাভষ্ম কুড়োব, হে প্রভু
পুরনো শরীরের কি অপূর্ব মহক, ওঃ — যৌবনের ভার
তারতম্যের বিচারে ছায়ামানুষ আর পেরোয়া কামুক মানুষের মধ্যে
উলঙ্গ ছায়ামানুষই সুন্দর, কিন্তু
কামুকমানুষ প্রিয়- মানুষ যার পেশীতে অদ্ভুত পূর্ণতা, বাক্যচঞ্চল, হে প্রভু
অমার্জিত ভালবাসা বলে কেন ধিক্কার দেয়া — স্ফুলিঙ্গিনী —
মধ্যরাতে ম্রিয়মান ঈশ্বর —
সর্বকালের সেরা যিনি বেখায়ালী, তিনিই হৃদয়ভূখণ্ডের অলীক পুরুষ।

ফারাহ্ সাঈদ- এর কবিতা from California

লেহাজের দাম

সেই একপ্যাচে শীতকাল!
দ্যুতিময় কাঁচের বোয়ামে
নিরাকার কসম জমা হয়
আর লেহাজের দামে শ্যাওলাপাড়ায়
হামাগুড়ি দেয় সিনড্রোম
সেদিন ভেতরঘরে এক শৈশব দুলছিলো
আর তার সরু হয়ে যাওয়া হাত
লগন আসেনি বলে
মাতৃগর্ভে ফিরে গেছে যারা
অসামান্য রাহি হবে সে
এবার আর খুনি নয়
প্রত্যুত্তরে ভাড়াটে- মিনিট
ঘোড়া- সওয়ারীর আদাব আদাব!

বাগানের জোড়া ক্যাফেইন

শুনেছি সেদিন গ্রিল ও তার বাহানা খুল্লেই রঙ
ভাবিনি এতটা আন্তরিক মেঘালয়
আমাদের হয়; তোমাদের হয়না সাপ
তবুও বাগানতো একটাই
নির্যাসে কী এক এনজাইম
ধূমায়িত কয়েক ফোঁটা
তাইতো লালচে ত্বক
দুধের নিস্তার পাবার উপায় বলে দেয়

মালিনীছড়ায় লিকার নামবে সন্ধ্যায়
খানিকটা তেতো, শোনোনি?
যেনো হঠাৎ সেরে উঠা ব্রণ
চিনি দানাদার;
দ্রুত পান করো তোমাকেই—ইজারাবিহীন

দাঁতাল রোদের ডাংগুলি

ছোটবড় পাতায় ডাংগুলি রোজ
এ রকম খেলাও আছে যে
দাঁতাল রোদ অভিভূত হলে
হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসে রাবারবাগান
যেনো কিছুই পোড়েনি
অথচ টানেলে তখনো দড়িলাফ র‍্যালি
কি এক হরপ্পা!
প্রত্নস্থল থেকে বেয়ে ওঠা
ওঠে বসা পুরনো খাতে!
ফেনার স্বাদ দিনভর দাপট দেখালে
দু'টি আপেল ঢুকে পড়ে মেটালিক্স চত্বরে
অথচ লুকিয়ে রাখার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নেই

অহল্যার ভাইভা

বিলনডাঙায় পলেস্তারা খসে পড়ে রোজ
এ কোন পরগণায় শান বাঁধায় মন
নিউরনে স্বপ্নতাড়িত ভাইভা—

কী এক মাশরুম হল্লা !

তবুও দেয়ালের আত্মহনন ভুলে থাকে বুধবার।
ফলত বর্গাকৃত বারান্দাটির দূরে সরে যাওয়া কিংবা
কাছে আসার গল্পটি আর পুরোনো হয়না।

মাংসেরা অহমের ঘুম পাড়াতে গিয়ে বলেন, অহল্যা!

প্রণব পাল- এর কবিতা

ভাষাবদলের মন্দাক্রান্তা ১১

যেই চোখ খুললাম দুনিয়া বেলাগাম চুমছে দেখলাম আমার নাম
ধুম শব্দের পায় ঘুঙুটে ধ্বনিমায় বাজছে আলপিন কোয়ান্টাম
রোদশ্রীর ফ্রেসচার মলাটে বাঁধাবার ফুর্তি আনচান যৌনদীর
চাঁদতার দুধস্নায় ক্লিকিত ক্যামেরায় শুনছে গুণভাগ অল্পমির
মিথ্যের রোদলাফ বানানো ফটোগ্রাফ সত্যি অ্যালবাম কোথায় আজ
কেউ ঠিক কাঁদছেই আঁধারে নিজেকেই লাগছে হ্যাভনট্ ভড়ংবাজ
সাতরোদ চিক্যের কতটা মানুষের কেউতো গাইছেই অন্নরাগ
একপেগ ধিনতায় কতটা ঢাকা যায় বিশ্ব লুটবার ঘৃণ্যদাগ

ভাষাবদলের মন্দাক্রান্তা ১৪

পায় পায় ট্যুরক্লিক নতুনে মিউজিক বাজছে জঙ্গল গাছ পাতায়
ঘোর ভেজ সন্ধ্যায় একেলা একাপ্রায় চুপটে জঙ্গল ঝিম্রতায়
থমথিক মিউজিক নীরবে নিরবিক লাগছে চুপচিক নেশান্তর
স্তব্ধের সুন্দর লেগেও অনাদর জাগছে নিশ্চুপ ভ্রূণ শিকড়
মিথময় গর্জন ফবিয়ে রাখে মন খুল যা সিমসিম্ সবুজ সুখ

পায় পায় বনপ্রাশ ডিঙিয়ে কচিঘাস থ্রিলছে ট্যুরবাজ ভ্রমণতুক্
একলার নির্জন দু'পায়ে আমাজন বন্য উন্মাদ ডাক পাঠায়
জান্তব আয়নায় নিজেকে নিজে খায় নিত্য বদমাশ কোলকাতায়

রঞ্জন মৈত্র- র কবিতা

ও' ক্লক - ১

ঘড়ির ফাঁকা অংশে কিছু হরফ এসেছে
নিস্কায় নিশি যায় দিনও
দেখা হবে অ- বেলায়
দূরে দূরে পেন্ডুলাম
ছায়া ছায়া হোম- স্টে, তালসারি, পাইনোটাইপ।
শুয়ে আছে মোম ও কলম
কার কাছে শিখাগুলি
ম্যারিনেট করা শব্দগুলি কার কাছে
ফাঁকা অংশে জন্মরোল
হাবাগবা কুসুম ও কন্ডোম

তুমি এ নরম সহ্য করো
বীজতলায় বসে আছো জিলেটিন
কলতলায় সুহানিয়া বাই
গাঢ় লালে ম্যাপ হবে
উড়ন্ত মাংসকুচি স্পট করবে পিকনিক
চাকার দাগের নিচে সহ্য করো লালমাটি
সবুজ ম্যায়খানার নিচে খুংখার অ্যাঞ্জিও
উনুন কড়াই হাঁড়ি
সানুদেশে ডেকচি বারকোষ

হরফ চলেছে
ঘড়ির সামিট নেই
মৃত্যু ও পতাকা জানা নেই

ও' ক্লক - ২

দিন তুমি বলেছ
আর জার্সি গায়ে নেমে পড়ল মাঠ
সাইডলাইন বেজে উঠল
অ্যালার্ম ও তার লাল ঝুঁটি
চাইম রাইম
গোল হবে ফুলে উঠবে
সামান্য ধোঁয়া ছাড়বে রুটি আমাদের
আমাদের মা, পিসি, ভোলার দোকান।
দৈনিক পত্রিকার কথা বলেছিলে কিনা
মনে করো মনে করো
তুমিই বলেছ দিন
পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে সূর্যের ফোকাস
লাশের উপর
সংকাশের উপর জবাকুসুম
মাথায় সেন্টার করে তেল মারতে বাঁশি বাজল
খেলা শুরু হয়ে গেলে কথাবার্তা নেই আর
দিন নেই
ঘড়ি নেই
তোমার জার্সি খুলে উড়ে যায় বল বলরুম আর
আমাদের আড়বাঁশি, রোহন কানহাই

জপমালা ঘোষরায়- এর কবিতা

ঝুমরা ও ম্যাটারনিটি song

ঝুমরা : —
ঢোলকাটা লেংটি ইঁদুরের চেয়েও লেপিসমা পোকারা ভয়ংকরভাবে অক্ষর কাটে বলে সাক্ষ্য প্রমাণহীন গালগল্পের দমদার মশালা হয়ে যায় যাবতীয় ঝুমুরগানের রিমিক্স।

কোমল ঋষভের বিষণ্নতা কিছুতেই খেয়ে ফেলতে পারছে না কড়ি মধ্যমের কড়ক। ফলে ঝুমরার গায়কী বিলাবল ঠাটেই ফিক্সড মোড। আনন্দভরা এই ভুবনের গানে পণ্ডিতজীর চিরহরিৎ মেলোডি উথলে উথলে উঠছে পুঞ্জিভূত ব্যথা সঞ্চিত সুখ কথা ভুলচুক নিঠুর কালের অতিরিক্ত ক্ষরণ। মধুরতম দুখগান। "নাম কাম গ্যাসে গিয়া ঝুমরার। গাঁজাইয়া ঝিমঝিমাইছে।"

ও ঝুমুর গায়েন তোমার দিন কাটে না তোমার রাত কাটে না.... শুধু ঢোল কাটে লেংটি ইঁদুরে... বাম বাবাম.... ও বাবাম.... বাম বাবাম. . . . .

বড্ড বিকারহীন বিকৃতির আগ্রাসন ঝুমরা হে ! স্প্যাজম হচ্ছে নার্ভাসসিস্টেমে, গ্রে ম্যাটার ক্ষয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কের। আমাকে এবার কানে হেডফোন গুঁজে রাস্তা পার হতে হবে !

ম্যাটারনিটি song : —
গেরস্থের খোকা হল দুগগা টুনটুনি বলল কি না বলল কাগের মুখে বার্তা শুনেই গোপীভাবিনী ললনারা মাতৃসঙ্গীত গাইতে এলেন। বাবা হতেই পারতেন কিন্তু দমন রমণের পুংনীতি ফুঁৎকার দিয়ে তাঁরা মা হতেই চাইলেন।

চাইলেন এই ভেবে, মা হলে মাটি বরাদ্দ হয় আকাশ বড় হয়। বরাদ্দ জলের মাছেরা নিয়ন্ত্রিত বাতাসের বুদবুদে খাবি খায় মাথা কোটে রঙীন পাথরে। মাৎসর্যের মাৎস্যন্যায় নিপাতিত মানবীয়ানায়। চোলিকে পিছে চুনরি কে নীচে।

আবে! গাম্বাট ফাটা কেষ্ট! তোমার দলবল কোমর থেকে টেনে নামাবে আর তুমি ওপর থেকে আঁচল সাপ্লাই দেবে? পুংনীতি? আমার দলে এখন তাঁরাও, গোপীভাবিনী ললনারা। চটাচট তালি মেরে গলা খাঁকারি দিচ্ছেন মর্দানী। মেরে অঙ্গনে মে তুমহারা ক্যয়া কাম হ্যায়??

সব্যসাচী সান্যাল- এর কবিতা

গোয়েন্দা গল্প

৩১।
মানুষ, মানুষের মতই
নির্বিকার
তার মাঝখান দিয়ে হাওয়া
হাওয়া, যে সিদ্ধান্ত থেকে কয়েক শো হাত দূরে
উড়িয়ে দিচ্ছে টাম্বল উইড
আর এই সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে বসে আছেন গোয়েন্দা। ক্রমে জমে উঠছে তাঁর বয়ন। গোয়েন্দা বোঝেন- - শেষ পর্যন্ত মিশ্র মাধ্যমের মধ্যেও মানুষ শুদ্ধি খোঁজে, কারণ শুদ্ধতাই তাকে সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়।

ছোটবেলায় শোনা দুধ থেকে সরিয়ে দেয়া জলের বয়ান আর হাঁসের গল্প কখন যে একটা ফাঁস হয়ে ওঠে—খুনী তাকে ভালো ভাবেই চেনেন। আর চেনেন বলেই তিনি গোয়েন্দার থেকে তাঁর যুক্তিকে সরিয়ে দেখেন না। গোয়েন্দার সন্দেহ থেকে অক্ষর সরিয়ে চুপিসাড়ে ঢুকে পড়েন তিনি ফাঁকে ও ফারাকে। চারাগাছকেও বরফের তলায় তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেন, কম পক্ষে আর এক ঋতু... আর এক ঋতু।

৩২।
বিপর্যয় থেকে উঠে আসা পায়ের ছাপ গুণতে গুণতে কিছু শব্দ মানুষের ভেতর চিরজীবনের মত ঢুকে যায়, মানুষ তাকে ভারী আপন করে ফেলে ভারী হারিয়ে ফেলে—এতটা গোয়েন্দা জানেন—তাঁরও ভেতরে খেলা করে মাটি ও পারদ, খুন হয়ে যাওয়ার মুহূর্তের বিস্ময়—সেটুকুই সৃষ্টি। বাকী তো আলো, যা নিয়মের, সূত্রের. . .
সূত্র মুছতে ফিরে আসেন খুনী, আস্তে আস্তে ঘটনা তাঁকেও মুছে ফেলে...মৃদু একটা তার্পিন তেলের গন্ধ সীডার বনের থেকে উঠে আসে...পায়ের ছাপের অন্তর্স্থল থেকে উঠে আসে. . .

৩৩।
মানুষ ততটুকুই যতটুকু তার বর্জন, এই মত গোয়েন্দা ভাবেন। চায়ে চিনি গুলতে গুলতে ভাবেন। দৃশ্যের মধ্যে উত্তর আবছা হতে থাকে, পূর্ব ঢাকতে থাকে কাশে ও সংকাশে। পবিত্রতা বলে মানুষ যাকে চেনে, সে এক নির্লিপ্তি—এতটা খুনী বোঝেন। খুনী বোঝেন, মানুষ এক ঢলের মত, ঢেউয়ের মত আছড়ে

অবশেষে একে অপরের রেখাবে খামারে- - রেণু- রেণু ছড়িয়ে পড়ে—তার প্রয়োজন শুধু ঘুর ঘুর করে স্টক মার্কেটে, মলে, ওয়াটার পার্কে। খুনী দাঁড়িয়ে পড়েন। সাবুর পাঁপড় হাতে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন।

অনিন্দ্য রায়- এর কবিতা

রিয়েলিটি শো

বিষুব বিয়োগ, টেনে জন্ম ছাড়ালাম
তবু অনুষ্ঠান নেই, প্রস্তাব আত্মীয়
টানে আরো, জিহ্বা বড়ো হয়
ডিম অব্দি, অঙ্কের বই উল্টে উত্তর অব্দি
কল্পনা নেই, নামের বিকল্পে পেরেক পোঁতার জন্য
হাতুড়িকে পদবি করেছি আর তোমার চাই না

রিপুদল

এক

দু ফাল পৃষ্ঠার মাংস, নসিয়াও পতাকা তুলেছে
ভ্রমর পুরোনো কাব্য, চুল্লিবাজি
ঢোকাবো অতটা

বন্ধ অফিসের মধ্যে পাখিয়াড়ি
খাদ্যের শৃঙ্খলা

দুই

কলাপাতা, মুখের ব্যঞ্জন
ভোর ও বৃষ্টির মধ্যে
প্ররোচনা, ব্যবসা যেমন

ছিঁড়ে ফেলব আগুনের প্রচন্ড

ফোস্কাদের নিমন্ত্রণ এই

তিন

এই গুল্ম, নিদ্রাখোর, উপড়িয়ে
আঙুল সুখদা
চোখ আরো সর্বনাশ
চৌষট্টি পরগণা থেকে
হুম আসছে
কান্তার
কান্তার

পারলে চরিত্রে ধুই, লোভ ফুটকি

খাই, অতশত

অগ্নি রায়- এর কবিতা

একটি খরার প্রতিবেদন

গোটা গ্রাম যখন তার জ্বলন্ত নর্দমা আর ঝেঁঝে যাওয়া ঘাসজমির গেরস্থালী

নিয়ে বৃষ্টি- বদলার জন্য নিল ডাউন খাওয়া ছাত্রের মত ঘাড় গুঁজে থাকে,
তখন তোমার চশমার বিখ্যাত লেন্স ঘেঁষে রিপোর্টাজ লিখতে বসি। কি- বোর্ড
এবং ডুবন্ত আঙ্গুলের ঘর্ষণ থেকে ধীরে ধীরে যুক্তি সমবায় খসে গিয়ে অন্য
সেচব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। তাপমাত্রার কথা বলা হয় না, ছেলেবেলার
ভুলগুলি মেঘ হয়ে নেমে আসে নিউজপ্রিন্টের উপর। সঙ্গে আনে রিটায়ারমেন্টের
গলিমুখে দাঁড়ানো জবুথবু ভূগোল স্যারের কথা কাটাকুটি। ঝাপট আসতে থাকে
অক্সফোর্ড অ্যাটলাসের রেগিস্তান থেকে আর ধুলোবাতাসের শুকনো দুঃখে বানান
একটু একটু করে বদলে যায়। স্থানীয় সংবাদদাতার বদলে লিখে ফেলি মৃত বন্ধুনাম।
খেতের ওই মরামুখের ছবি সুপার কম্পোজে চাপানো হয়। গোপন আর্দ্রতার খবর
পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না।

পীযূষকান্তি বিশ্বাস- এর কবিতা

ইঞ্জিন

পেটে আগুন নিয়ে যে খেলাটা

স্পোকের অভাব টের পায়না
কোন চাকা আর

যতটুকু চিনি
নিজেকে চেনার এক অভিনব প্রচেষ্টায়
প্রতিষ্ঠার মাপ থেকে নিজেকে ছোট করে ফেলি
দাড়ি কমায় আঁটোসাটো বেঁধে,
গ্রাম, লিটার যা কিছু পরিমাপ যোগ্য
যে তাড়ণা আমাদেরকে এক রাস্তা থেকে অন্য গন্তব্যে ঠেলে নিয়ে যায়
যাত্রার প্রতিটা সেন্টিমিটার শিখে নেয়
কিভাবে আঁকা হয় কঠিন উপপাদ্যের এক্সট্রা জ্যামিতি

হায় ইঞ্জিন !
বিবাহ বিচ্ছেদের মত দ্রুত পর হয়ে যাচ্ছে
পাল্টে নিচ্ছে ঘর সংসার,
পড়ে থাকছে জং সহ চেসিস,
আদাড়ে, ভাগাড়ে রিক্সাদের জিম্মায়
কোন কাবাড়ে আজ তাঁকে আর লক্কড়ের থেকে মেহেঙ্গা ভাবে না ।

রিসাইকেল বিন

যতবারই আগুনে দাও হে প্রহ্লাদ
জন্মের ইতিহাসকে ছাইগাদার নীচে স্থগিত রাখো,
সন্ধানী চোখ
খুঁজে নেয় বাইটে বাইট, ফাইবারে ফাইবার
একটি কামড় থেকে আরেকটি কামড়ে প্রতিসারিত হয়ে যায় আলো !

কারকাসের ভিতর থেকে উড়োজাহাজ বের হয়ে এলে,
আকাশে একঝাঁক ফিনিক্স
দারুণ ইম্প্যাক্টে ধামাকার শব্দধ্বনি কিভাবে আকাশকে জাকড়ে ধরে !
হে অরুণ, তুমি তো পঞ্চাশ বছর ধরে যমুনা আর গন্ধ নালার বৈসাদৃশ্য দেখে গেলে
কখনো, ব্লাস্ট আর ব্ল্যাক বক্সের সম্পর্ক
খুঁজে দেখ,

হাড় হিমকরা ডিলিটেড ফাইলগুলো
রিসাইকেল বিনে পড়ে আছে।

ভাস্বতী গোস্বামী- র কবিতা

ভাইরাস ৩

পাখি পড়ার শব্দ পাই
জানলা ও মেঘ দূরের হলেও পাখা
যেমন হাল্কা অসুখ
তাপে কাঁপছে শায়েরিয়াতন্
রেটিনায় কাটা বিদ্যুৎ
ধাক্কায় উড়ে যাবে ভোরের পাসপোর্ট
সারাতেই হবে এ অসুখ
যখন আমরা
কতটুকু হতে হতে ফোটায়
সকাল স- কাল
গন্ধে একটা প্রাইমারী স্কুল লেগে থাকে

ভাইরাস ৪

ডিম ভেঙ্গে চলে যাই সূর্য কেটে নিতে
নদীর ভিতরে মাটি
মাছ ও নৌকোর যৌন দুপুর

আঁটোসাঁটো রোদ পড়ে অসুস্থ হয়েছে মেঘ
ঠোঁটও ঘুমিয়ে থাকে
চাঁদের চিবুকে

কোথাও জমে নি ব'লে
তুমি মেঘ ফলাতে যাও

কোথাও জমে নি ব’লে
তুমি মেঘ খুলে দাও
পোশাক সরিয়ে এগিয়ে আসছে রাত ও মৃত্তিকা

নীলাজ চক্রবর্তী- র কবিতা

নতুন এয়ারপোর্ট

তবু ছায়া সরছে না
ফ্যানা ফ্যানা শহর
ফুরিয়ে আসছে চামড়ায়
আর কাট বলতেই
বাতাসে ভারী হয়ে ওঠা
একেকটা সার্কাস রোয়ের গিঁট ধরে
বরফ ছুটে আসছে
ওখানে
আলোর লাল
মুড়ে ফেলছে কেউ
পতাকায়
লেপটে যাচ্ছে দৃশ্য নম্বর তিনে
স্তন থেকে স্তনের আকার ঝরে যাওয়া
মৃত ঘোটকীর স্তূপ
লুকিয়ে ফেলছি বইয়ের পাতায়
ফাঁকা মাঠের মধ্যে
একটা বাথটবের ধারে বসে
আমরা
চৌকো চৌকো কথাবার্তা বলি

স্ট্র দিয়ে
নাড়াচাড়া
ফ্যানাগুলি
গাছের দিকে আরও গাছ হয়ে যাচ্ছে. . .

দীপঙ্কর দত্ত- র কবিতা

হুলা

যে প্রথম পাখিটি হুইসলব্লোয়ার স্কোয়াশ্ ছিটকে ফেলছে ঘেরাবন্দী, ফেউ ও ঢিন্ডোরা
কাঁকই আঁচরে চূড়ো করে তোলা আগুন আর স্তন এই শৃঙ্গী ফিরদৌস,
ঢাল বেয়ে জিভেদের গ্রাঁ প্রি লবণা লাবণী
বস্তুতঃ এল রডের ডোরাডো ঘূর্ণীর পর
চিড়ি ও রুহির তন্ মন্ কোকোরং সমস্ত স্পঞ্জ চুষে দেখেছি সবার উপরে সত্য ক্লিটোরাল —
বুন্দাবান্দিতে ক্ষেত ও মাচানে এযাত্রা পাখিদের খারিফ হলো খুব
খামার উপছে পড়ছে জরদ, কুহু দুল্হনিয়ার ড্যাফোদিলওয়ালা আফতাব
আর এখন যখন আরেকটি চন্দ্রিমা দোর আঁটে, ওলো ছই ওলো গামারি তক্তার পাছাগলুই,
তিনটি কামরার সিপিয়া টেলপিস নিয়ে ধুঁয়াধার লোকো হে লোকো,
রহম্ —
চোরা বালি থেকে কখনো মাথা খুঁজে, এক প্রস্থ ধড় খুঁজে খুঁজে জুড়ে জুড়ে ইন্দ্রপ্রস্থে একা
ফুলটু স্কিজয়েড খচ্চর চালনা শিখেছি অভিজাত ভীড়ে
কাক ভোর ভোর শাকিলের যখন ফোন আসে উবের হর্ণ,
ধারদার চপাররা সুইং নেয়,
ড্রপ খেতে খেতে ছিন্ন হরিৎ ক্রান্তি ঢুকে যায় একেকটি রোমশ গল্ফ বিবরে —
ক্যানেস্ত্রা থামে মশালের আহ্নিক গতি,
বেঙনি ত্রিভূজ শনাক্তিতে নামি, স্ট্যাম্পিডে বিকৃত মুখ খ্যাদানে হুলাদল —

নার্গিসিস্টিক নার্সিসাস

ইজাকিউলেশনের পর অণুপল জিরিয়ে নেওয়ার একটা সিগারেট, দুটো টান, তক্ মানা —
ফ্যাদা আটকে ডিভান থেকে ওয়াশরুম একটির পর একটি বিড়ালচলনের
পোহানু এক ঘিণোনা আঁতোয়ানেত অঘ্রাণ
চ্যাটার্লিরা সবাই হামামে মুখুজ্যি, নিরোম রেণু রেণু লেডি
মালাই মারকে ডাভ ঘুরছে ক্রিমি কৃমি কবহুঁ আজানু, কভূবা উচ্চে, নিদাঘ অবচে —
অ্যাবসলিউট যখন মুখটি তুলে চলে
ক্যাঙারু কোর্টের বাইরে ঝুলে পড়ে এইসব দীর্ঘ দীর্ঘ ঊ- র বাহবাহী, ক্রোকোডাইল চিয়ার্স
অপ্সরা যখন প্রত্যাখ্যাতা ইকো, রক্তে মুখ ঠুসে নেমেসিস বলছে দ্যাখ নিজের ছবি —
ঢোল- ডগর গার্ডেনরীচের ?
না
ঢোল- ডগর ডিগলা রোডের ?
না
ঢোল- ডগর বুড়ির মাঠের ?
না
ঢোল- ডগর কালকাজীর ?
না
ঢোল- ডগর পুষ্প বিহারের ?
না
ঢোল- ডগর সরিতা বিহারের ?
না
ঢোল- ডগর ভক্তিনগরের ?
না
রাণীরা বলিলেন, তবে তোমাকে কাটিয়া ফেলিবো
তখন একদিক হইতে বুদ্ধু ডাকিলো — মা
আর একদিক হইতে ভূতুম ডাকিলো — মা

নূপের গাঙে নূপ ভেসে যায় —

গত সংখ্যার পাঠ- প্রতিক্রিয়া

Pijush Biswas : হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ আ হাইওয়ে। কখন যে ঘড়িতে কটা বাজে টের পাই না, সকালের রোদেই মাঝে মাঝে বিকেলের চারটে বেজে যায়। ঘড়ির ব্যাটারীটা চেক করি, পালটে নিই নতুন নিপ্পন, টাইম একই থাকে, বুঝতে পারি না একটু একটু করে দিনের অনেকটা সময়কাল আজকাল শূন্যকাল নিয়ে নিয়েছে । ২৪ বাই ৭ কাজে ডুবে থাকা। আমার প্রলম্বিত দিন আর সীমিত জ্ঞানে যা বুঝি, এ রকম উন্নত মানের সাহিত্য কর্ম আমার এই ছোট্ট জীবদ্দশায় কখনো দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। তার উপর দিল্লিতে থাকা, এই সব মিলে নিজের সাহিত্য প্রেম নিয়ে বিশেষ লাক্সারীর অবকাশ নেই, এই পরিবেশে কি করে দীপঙ্কর দা এই ভাবে শূন্যকাল কে এতটা উচ্চতায় নিয়ে যাবে কখনো ভাবতে পারিনি। একজন দিল্লিবাসী হিসাবে গর্ব করার মত। এই শূন্যকালের ফ্রিজে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আইস ক্রিম এক একটি ব্রেকে প্যাকড হয়ে বিরাজমান। একক প্রচেষ্টা, প্রতিকূল অর্থনৈতিক ডামাডোল কোনটাই এই প্রত্রিকার অগ্রগতির বাঁধা হয়ে ওঠেনি। জানতে ইচ্ছে হয়, যারা ৭০ বছর ধরে যমুনা আর গন্ধ নালার পার্থক্য খুঁজে এসেছেন তারা কি এই কাব্যধারার তীরে কখনো চিল্ড কিংফিশার নিয়ে বসেছেন ?

Jayashri Ray : Congralutions. I want to participate and host a kobi shabha. Thanks.

Tusharkanti Roy : আগের অনেক লেখা পড়েছি! ভীষণ আধুনিক এবং যুগোপযোগী! অভিনন্দন!

সব্যসাচী সান্যাল : এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। প্রত্যেকটি লেখাই ভালো লাগল। শূন্যকালের সম্ভবত সবচেয়ে ম্যাচিওর সংখ্যা এটি। আগের মতই কিছু ছবি Gory, কিন্তু অনেক subtle. আরো অনেকবার তারিয়ে তারিয়ে পড়ার খায়েশ রাখি।

Tanmay Basu : কবিতা নয় একদলা থুথু! পান পরাগ আর খৈনিতে থুথুও শালা বেশ্যা হয়ে গেল! !

Moulinath Biswas : এবারের কবিতা অংশ বেশ ভাল। এগিয়ে যাও।

Novera Hossain : Congrtas. . .

Radheshyam Ghosh : কী বলবো? ভীষণ ভালো। অনেকগুলো লেখাই ভালো লেগেছে।

Deb Choudhury : এই শূন্যকাল কি সেই জিরো- আওয়ার পত্রিকার ওয়েব সংস্করণ ?

Tanmay Basu : @Japamala GhoshRoy ভরে গেল - - -

Tanmay Basu : @Indranil Ghosh সম্ - উফঃ!

Pijush Biswas : @Pronab Pal খ্যাক খ্যাক, ওরে ক্ষ্যাপা, দ্যাখ দ্যাখ, আঙুলটা কুমারী কলমকে প্রেগন্যান্ট করে দিয়েছে. . .

Debjani Basu : @Pronab Pal Apnar kriyapad niye chhutanta chouko botamti ebar Britta hoye chhut chhe pratham kabitar sange dwitiya kabitatar etai parthakya.

Debjani Basu : @Anindita Gupta Roy Apnar noisargik jagat ar manuser toiri ei prithibir majhe apni jibanta fossil er kannay nijeke dhuye nichchhen. Opurba snigdha bedanamadhuri te vora apnar ucchar angul i .

Pijush Biswas : @Ranjan Moitra আমার একটা পত্রিকা পড়তেই পুরো মাস লেগে যায় । এর মাঝে আমি নিজস্ব ভালোলাগা গুলো রিডিফাইন করে নিই, এর মধ্যে আবার যোগ হয়েছে রঞ্জনদার কবিতা । রঞ্জনদাকে মনে হচ্ছে বহুদিন ধরে চিনি । রঞ্জনদাকে একটা উড়ন্ত চুম্বন ! ডিম থেকে বেরিয়ে কুসুমের প্রচ্ছায়া ভার্সটাকে আলোময় করে তুলল !

Pijush Biswas : @Yashodhara Ray Chaudhuri যদি ভুল না করে থাকি, এই লেখাটির কিছু অংশ আমি কোন একদিন ফেসবুকে পড়ি । পেশাগত কারণে সারাদিন নেটে বসে থাকলেও কিন্তু কামেন্ট বা লাইক করার সময় হয় না। আর আজকাল মন ও আমার বিপরীতে অবস্থান করছে, যেভাবে স্বভাববশত কিছুতেই দরকারী কথা মনে করে উঠতে পারি না । মালুম হয়, এটা আজকালের মল কালচারের একটি উদাহরণ ? চারিদিকে এত কন্টেন্ট, এত অডিও ও ভিডিও, তারপর টেক্সট, আমাকে চারিদিক ধরে ঘিরে ধরে, ধরাশায়ী হবার এমন বিপন্নতাকে অভিসম্ভাবী বলে পাশ কাটিয়ে যাই । আমি কি আর আমি তে নেই ? প্রসংগত ভালো লেগেছে । আমরাও আকাংক্ষাশ্রমিক হয়ে উঠছি।

Pijush Biswas : @Dhiman Chakraborty বহুদিন পর ভালোলাগার মধ্যে আমার পড়া এটাই সেরা কবিতা । আর শুনছিলাম আট বছর আগের এক দিনের কথা,
" চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা - একা;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের - মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা "

ধন্যবাদ এমন একটি পোস্ট দেবার জন্য । খুব প্রাসংগিক কবিতা

Pijush Biswas : @Debjani Basu নিজেকে নিংড়ে সোনা হবার বাসনা এই কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে, সোনা পুড়িয়ে পাওয়া যাচ্ছে পাহাড়, কবিকে চিনতে পারাটা আসল কিতাব । কিভাবে নিজকে দুমড়ে মুচড়ালে তুলে নিয়ে আসা যায় সর, প্রেমের প্রতিচ্ছবিতে ধরা পড়ে যাপনের রোমান্টিকতা, আমরা জানতে পারি, কিভাবে বৃষ্টিরা শিলাকে ছুঁতে চেয়েছিলো আর পিপাসারা কি ভাবে সংগম হতে চেয়েছিলো ! এই হলো নারী । এই খরার দেশে একজন মহিলা কবি বৃষ্টির চাহতার কথা তুলে আনতে পারেন । যেটা উহ্য রয়ে গেলো সেটা পাহাড়ের আকুতি, যেখানে প্রতি মাসে বৃষ্টিরা স্নাত হয় আর শিলার জন্ম দিতে দিতে তারা মাটি হয়ে যায়।

Debadrita Bose : @Ranjan Moitra অসাধারণ একটা লেখা রঞ্জন দা। কতবার যে পড়লাম।

Suman Mallick : anek suveccha dada. . . . . .

Taimur Khan : সুন্দর পত্রিকা, ভাবনার অবকাশ আছে । প্রতিটি লেখাতেই নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে ।

Debjani Basu : @Ranjan Moitra Ranjan prathame tomar berate na jete parar byapartay Mon kharap laglo. Tarpar Mon alo kore je dhwanir alo elo tar ananda opaar. Bahupathita kabita tike ektu karunras mishiye porte valoi laglo. Khub anandaraser kabitatir background ato dukkher !!!

Pijush Biswas : @Debadrita Bose দেবাদৃতার এই প্রথম লেখা আমি পড়লাম, ওর লেখার মধ্যে একটা সভ্যতা জন্ম নেয়। আগামীর বার্তা। ও বড় কবি হবে। ওকে আমার অনেক শুভেচ্ছা আর ভেজিটেরিয়ান ভালোবাসা। ওর সাথে আমার পরিচয় কলকাতা বইমেলায়। ও যে কেন ওর বইটা আমাকে দিলো না ! আমি ওর অনেক লেখা মিস করলাম।

Debadrita Bose : Pijush দা, থ্যাংক ইউ। ওই সময় আমার কাছে বই ছিল না। পরের বার দিয়ে দেব।

Pranab K Chakraborty : Byapak. Abassyoi porbo nijer prayojane. Samridhhwa hote.

Dhiman Chakraborty : Purota pore fellam ekbarei - osadharon. . . .

MD Alauddin Khan : মলয় রায়চৌধুরী পর্যন্ত পড়েছি। বাকীগুলোও সময় নিয়ে পড়ে ফেলব। ভালো লেগেছে।

Ranjan Moitra : Aasole aalo je ki bhabe aasbe amra jaante paari na Debjani. Sedin obhabei esechhilo. Ei ar ki. Thanks.

Barin Ghosal : @Ranjan Moitra কী দুঃখ যে পেয়েছিলাম রঞ্জু, তোকে সেই যাত্রায় সঙ্গে না পেয়ে। আমরাও গ্লাসে যখন ঢালছিলাম তখন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল । বুঝেছিলাম - - এই হল আলো ঢালবার শব্দ, এটা তুই মনে করিয়ে দেওয়াতে আমরা আলো ঢালবার শব্দ বুঝেছিলাম। টুপি খুলতাম যদি স্বপনের মতো পড়তাম আমিও।

মায়াজম- স্বপ্নের উড়ান : @Pijush Biswas সেই অদম্য ইচ্ছেরা, অথবা যার নাম আকাশ, পাখির পালক কিংবা বৃষ্টিভেজা আলপথে ছাগলের পেছনে বৃষ্টিমেঘবজ্র ভাঙা হাড়গিলে বউ, অথবা মাল্টিপ্লেক্স এ বিচিত্র আঁধারে স্লিভলেস টপ আর ফেড জিনস এর সেই উদ্দাম একুশ ... অযথা বৃষ্টির শব্দ নেই , তবুও টাপুরটুপুর . .. স্ক্রিনের ভেজা তামাম প্রচ্ছদ জুড়ে শ্রাবণ ও শ্রাবণ . . .
কোন সূক্ষ্মতার মাপকাঠিতে চেতনারা স্থান- কাল- পাত্রের নির্ভরশীলতা ভুলে অনুভবে যখন গ্রামের হাড়গিলে বউ শহুরে আদুরে মেয়ে নন্দন চেতনার কাছে (নিজের কাছে ও বটে যখন শিল্প হয়ে ওঠে , গল্পটা সেখান থেকে শুরু করা যায়, তবুও করব না, সম্পাদক এর পারমিশন নেই) যখন বিলীনের শর্তে আকাশের মেঘমুক্তি ঘটিয়ে অন্ধকার বিছানায় একে চলে অপ- সরার কথা, তখন যদি দেখি শব্দেরা ততখানি উৎসাহী নয় কবিতা লিখবার ।
পাঠ্যক্রম ভেবে যাপনের স্নেহ টুকরো লিখতে বসলে নতুন কোন ইমারত নেই যাতে কেউ কোনকালে রঙ দেয়নি, আসলেই রঙের পর্যাপ্ততা আমাদের রঙহীনের দিকে নিয়ে গেলে বুঝি একটা রঙ রোপণ করা মানেই রঙের পরমাণু ভঙ্গ শুধু, যেন ইলিশের তৈলে ভাজা ইলিশ, অথচ এইটুকু নিয়েই দম্ভের সমুদ্র গড়ি, এইটুকু নিয়েই ভাবি শব্দেরা আসলে মিথোজীবী !
কবিতা একটা চিত্র, নাহ চিত্র সঠিক নয়, কবিতা সময় ও স্থানের সাপেক্ষে একটা দৃষ্টি , যেন ট্রেনপথ দৃষ্টি ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে যায় (দৃশ্য বল্লুম না, ওটা বড় কাঙাল শ্রেণীর জন্য রেখে গেলুম, তাহারা দেখুক দৃশ্য), এক মিনিট পরের কোন ট্রেন কী সেই দৃষ্টি ফিরে পায় ? যে যেমনভাবে পারে , সে তেমন ভাবে ভাত খায় , তেমন ছবি আঁকে , এই অঙ্কনের শিক্ষক কেউ নেই, পৃথিবী নিজে একজন মস্ত বড় শিক্ষক, তার চে' বেশি বড় শিক্ষক দেখিনাই । কবিতায় রূপ হোক অনন্ত অন্ধকারের মত, দৃষ্টি হোক সাদা রঙের, অন্ধকারের ওপর সাদা অক্ষর এঁকে যাও ... এঁকে যাও

Avi Samaddar : @Arjun Bandyopadhyay অনেকদিন ধরে লালন করবো। অসাধারণ।

Sharbaaniranjan Kundu : Prathampaataa porhechhi. Comment korechhi. Aamaar pakkhe heavy diet. Aami uttaraadhunikataar samajhdaar noyi. Temon inspired hoi naa. Tabe jaaraa srishtti korchhe taaraa srishti koruk. Tumi art work gulo ki kore place karo jaani naa. Tomaar kaaje

ni sht haa aachhe boj haa j aay. Bhaal o t heko.

Debj ani Basu : @Pi j ush Bi swas "Wings er aral e apnar haoamahal ar t ar bi st r i t a j ami r sandhan peye ami mugdha. Tahol e pandul i pi OT r oomer chhayay bar bar khol os chhar e ei vabnat a di yei ki ar ekt a kabi t a j anma di t e par i na Ami ?

Swapan Roy : @Ranjan Moitra সেবার রঞ্জন'কে ছাড়াই যেতে হয়েছিল...কি থেকে যে কি হয়....রঞ্জন গেলে কি এই কবিতা লিখতে পারতো? যখন ফিরে তাকাই, একটা সাবাশি দিই নিজেকে, এই যে কবিতা নিয়ে বাইরে যাওয়া এ আমারই ভাবনা ছিল. . . সবাইকে নিয়ে কবিতাময় হাঁটা আর আড্ডা'র জন্য অনেক পাঁপড় বেলতে হয়েছে আমাকে... রঞ্জন তো আমায় কুন্ডু স্পেশালের ম্যানেজার এই নামে শুরু করেছিল... যাইহোক, এ রকম ঘোরাফেরার ট্রেক ও কতটা মিস করেছিল সেটা ওর এই কবিতায় ছোঁয়া যাচ্ছে, কবিতা পেতে আমরা বাইরে যাই, ফিরে আসি আর এ রকম সব অসাধারণ কবিতা লেখা হয়ে যায়!

Pi j ush Bi swas : @Debjani Basu অবশ্যই কোন কবিতার জন্ম দিতে পারেন, কবিতারা স্পার্ম হয়ে আশেপাশেই মুখ উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সঠিক ডিম্বের সংস্পর্শে এসে নিষিক্ত হয়, শুরু ভ্রূণের যাত্রা, এভাবে অনেক লাইন জুড়ে এক আন্তঃপ্রজাতীর সংগ্রাম আমাদের কবিতার রূপ নেয়...আমি কবিতার মাঝে এর মুক্তি খুঁজি !

Ranj an Moi t r a : @Swapan Roy দারুণ বলেছিস ম্যানেজার। কিন্তু আমার যে রকম কঠিন কোষ্ঠ তাতে না গিয়ে একটা কবিতা হোল, গেলে হয়ত দুটো হত। সত্যি কথা, তুই না উদ্যোগ নিলে আমাদের ওই অসাধারণ কবিতার ট্রেকিং গুলো হত না।

Ranj an Moi t r a : @Barin Ghosal সে কষ্ট আজো মাঝে মাঝে মনে আসে বারীন দা। ও দিকটায় আমার আর যাওয়াই হল না। তবে কবিতাটা লিখে আনন্দ পেয়েছিলাম। এতদিন পর আবার নতুন করে তোমাদের সবাইকার ভাল লাগা জানতে পেরে লেজ মোটা হয়ে যাচ্ছে । আমি কৃতজ্ঞ ।

Ranj an Moi t r a : @Pijush Biswas খুব আনন্দ দিলে পীযূষ

Ranj an Moi t r a : @Debjani Basu আসলে আলো যে কিভাবে আসবে আমরা জানতে পারি না দেবযানী। সেদিন ওভাবেই এসেছিল। থ্যাঙ্কস।

Ranj an Moi t r a : @Debadrita Bose ধন্যবাদ দেবাদৃতা।

Amal endu Chakr abor t y : শূন্যকাল ওয়েবজিন প্রথম থেকেই গন্ধে রংয়ে রসে ভরপুর। দীপঙ্করভাই একমাত্র তোমাকেই আমার হিংসে হয়।

Barin Ghosal : @Radheshyam Ghosh ভাল লিখেছিস রাধে। খুব টাইট কম্পোজিশন হয়েছে। দীপঙ্কর তোর প্রশংসা করছিল। হি ওয়াজ রাইট। তবে পাঠকদের জন্য মাঝে মাঝে চা সিগারেটের স্পেস রাখিস।

Barin Ghosal : @Sharbaaniranjan Kundu ছি ছি সর্বাণী। আমার সাথে রবীনদার তুলনা ! আমি তার পায়ের নখের যোগ্য নই। আমি একটা মাটির মানুষ। আমার কাছে রবীনদা পাহাড়প্রমাণ। চাঁদে আর পোঁ... হয়ে গেল যা।

Barin Ghosal : @Swapan Roy আমি মদ নিয়ে ভাবতে বসে গেলাম। এত উদ্বুদ্ধ করিস কবিতায় যে আঠা ফাঠা ধরে রাখতে পারে না। স্বপন। টুপিওয়ালা বিদেশি কবিতা লিখছিস রে বাডি।

Barin Ghosal : @Japamala GhoshRoy নবারুণটা চলে না। সিরিঞ্জ ফাটাফাটি। পুশ করছে না কেউ।

Barin Ghosal : @Indranil Ghosh তোর সঙ্গে সরগম মেখে ফাতনা এড়িয়ে কোথাও বসি চল ইন্দ্র। কী লিখেছিস !

Barin Ghosal : @Nabendu Bikash Roy উপমাদের তো কবেই গাঁছাড়া করেছিলাম নবা। তুই আর তাকে পাসনি এই উচ্চারণ সত্যি। কিন্তু খালি বোতলের পিঁপড়ে কেন ? চল ভরা বোতল নিয়ে বসে পড়ি মানুষেরা।

Barin Ghosal : @অভি সমাদ্দার ব্রেভো অভি। অসাধারণ লাগলো। কবিতার মধ্যে যে স্পেস পেলে পাঠক থমকে শ্বাস নিতে নিতে যা পড়ল তা নিয়ে ভাবতে পারে, তবেই ধীরে ধীরে সেই রচনাটি থেকে পাঠক নিজের কবিতা পেয়ে যায়। তখন পঠিত কবিতাটি তার ভাল লেগে যায়। তোর কবিতা দুটোর মধ্যে সেই সুযোগ তুই রেখেছিস। আমার ভাল লেগেছে তাই। আমি এই কথাই রাধেকে বলছিলাম।

অভি সমাদ্দার : আমি বারবার অবাক হই, স্নাত হই, এ তো পাঠ নয়, এযে অন্তস্তল, বারীনদা। আমি পলক দৃশ্যের চিলতে স্বজন, আর আপনি সেই দৃশ্যের প্রকৃত ঈশ্বর।

Barin Ghosal : @Dipankar Dutta আরি ব্বাস ! যেন ফেটে পড়বে এত চাপ। নদীজলে বন্যার মতো শব্দের স্রোত আছাড়ি পাছাড়ি খাচ্ছে, দীপঙ্কর। শ্বাস রুকে রুকে আচ্ছন্ন করে ফ্যালে সমঝদারি। দারুণ অগ্নিবাণে রে।

Barin Ghosal : @Pronab Pal দারুণ। প্রণবের ভাষাবদলের পুরোটাই, সবদিনে আমি সঙ্গে ছিলাম। প্রথম আর দ্বিতীয়টির মধ্যে বিস্তর সময়ের ফারাক। ভাষাবদলের কবিতার পথ একটা যাত্রাকালের পথ। শুরু থেকে কতটা উপরে উঠেছে প্রণব, এই দুটি কবিতায় তার প্রমাণ আছে। ছোট অথচ ঘন

কথায় পরিষ্কার জানিয়েছে প্রণব, তা।

Ranjan Mitra : @Pronab Pal তোর একক লড়াইকে সেলাম প্রণব । ভাষাবদলের একদম শুরুতে কি কি তোকে বলতাম পরিস্কার মনে আছে। পরে এবং আজ সেই সব পূর্ণতা দেখে আনন্দ পাই। একা একাই।

Barin Ghosal : @Anindita Gupta Roy নিচে দেবী সুন্দর করে বলেছে অনিন্দিতা। তোমার কবিতা ভ্রমণের স্বাদ উপাদেয়।

Barin Ghosal : @Dhiman Chakraborty ১৯৯১- এই বই আর কবিতাটি নিয়ে ধীমানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। 'দড়ি' কবতাটা বিশেষ ভাবে। মহারাজ- এর কাহিনীটি আমার তখনই শোনা। কবিতা কিভাবে মানুষকে জড়িয়ে ধরে, সেই জ্বলন্ত প্রমাণে দুঃখও পাই, আনন্দও হয় কবিতাটির অন্যার্থে সার্থকতায়। পারে। ধীমানই পারে।

Anindita Gupta Roy : @Barin Ghosal বাড়ি ফিরে চলো বাড়িকে ফেরাও কোথায় বাড়িতে চলো- - - - - - - - - - - - - - - - e tumi ki bhabe likhle BARIN DA?? amar lekhar katha chhilo, athoba ei line ta....তখন আমি ঘুরে দাঁড়াই
তখন আমার পা- ও ঘুরে দাঁড়ায়. . . . . eo to amari . . . . . hayto aro aneker .

Anindita Gupta Roy : @Indranil Ghosh boddo beshi bhalo

Barin Ghosal : @Pijush Biswas খুব ভাল কবিতা এটা পীযূষ। ততোধিক ভাল এটি গড়ে ওঠার পলকগুলি। 'রাবার স্ট্যাম্প'- এর জায়গাটা কিভাবে যেন দখল নিল 'ইলাস্টিকের মেঘ' - - - পবন পুত্রের কারসাজিটি বোঝা গেল। তোমার রচনায় কোন স্থির গল্পের বুনন নেই, সেটাই স্বাভাবিক। গণিত, বিজ্ঞান, সিনক্রোনিক শব্দজোয়ার একে অন্যের সম্পূরক। কিন্তু তোমার লেখায় তার ব্যাকগ্রাউন্ড জ্বলজ্বল করতে থাকে। কেয়া বাত !

Umapada Kar : @Indranil Ghosh কদিন আগে বাড়িতে শুনলাম ওর মুখ থেকে। সত্যি, সামান্য, প্রায় সহজ দু- চার কথায় এমন কবিতা লেখা যায় দেখিয়ে দিল ইন্দ্র। খুবই স্পর্শকারক। সাবাস ভাই।

Umapada Kar : @Ranjan Mitra আমি তো তোমার গুণমুগ্ধ। যা লেখো তাতেই আবেশিত হয়ে পড়ি। এখানেও তার অন্যথা হয়নি। তোমার কবিতার রান্নাঘর- এ আমি মজে গেছি রঞ্জন।

Umapada Kar : @Pijush Biswas ভালো লেগেছে পীযূষ। চালিয়ে যাও।

Barin Ghosal : @Debadrita Bose দেবাদৃতার এই বাংলা কবিতাগুলোর সাথে আমি পরিচিত, কিন্তু এসবের ব্যাকগ্রাউন্ড যেভাবে যে ভাষায় প্রকাশ করেছে তাতে আমি মুগ্ধ। কবিরা কত গভীর ভাবে ভেবে থাকে চেতনার অন্দরে আর সেখান থেকে জন্ম নেয় কবিতার ভ্রূণ, সেই কঠিন সময়টি মনোরম হয়ে ওঠে কবিতায়, এই কথা দেবাদৃতা বুঝেছিল, তার চেতনার আভ্যন্তরীণ মনোলগ ফ্রয়েডের ডিসপ্লেসমেন্ট থিওরি থেকে এসেছে, সেটা পরিষ্কার করে দেবার পরে অথচ, কবিতার ভ্যালু চেঞ্জ হল না। ভাবার কথা। স্পার্ম, জরায়ু, ভ্রূণ, কবিতার এইসব পরতগুলো খুব ভালভাবে প্রকাশিত হল। থ্যাঙ্ক ইউ দেবাদৃতা।

Debadrita Bose : heart emoticon বারীন দা।

Umapada Kar : @Debadrita Bose দেবাদৃতার এই কবিতাগুলি বারবার শোনার সুযোগ হয়েছিল। ভালো লেগেছিল। এক্ষণে তার রসায়ন ভালোলাগাকে ভালোবাসায় পরিণত করে দিল। কবির ভাবনার যে বিস্তৃতি এবং তারমধ্যে যে পিনপয়েন্ট তা একটা পাহাড়ের শীর্ষদেশ। সেখানে সে আমাদের চড়িয়েছে। খুব ভালো।

Debadrita Bose : heart emoticon উমা দা।

Barin Ghosal : Joyshila Guhabagchi "নেত্রনালি থেকে শিশু ঝরে" - - এই মূল কবিতায় কত কম কথায় পৌঁছে দিলো জয়শীলা। বাঃ !

Barin Ghosal : @Debjani Basu কোন কোন মজার দেশে নারী নেই - - - কী সাংঘাতিক ! আমি সেই দেশে থাকতে চাইনা দেবযানী। বরং ঘুঘুভুক মানুষদের বসে দেখতে থাকি, আর শিউরে উঠতে থাকি, এই ছটফটানি উত্তেজনা পেলাম তোমার রেডিওঅ্যাকটিভ মিনারেল বৃষ্টিতে, যার জন্ম এক অ্যান্টিম্যাটার থেকে। কবিতা আর ব্যাকগ্রাউন্ড, গড়ে উঠতে থাকে গদ্যের মধ্য দিয়ে। দারুণ লাগল তোমার শব্দবিস্তার।

Barin Ghosal : @Arjun Bandyopadhyay ভাল লিখেছিস অর্জুন। তবে অরুণেশ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই চোখ ওল্টাতেন। সেই হাংগ্রি অরুণেশ। যাই হোক, আমি নিজে এভাবে করতাম না স্রেফ পারতাম না বলে। তুই পারলি। একটা স্যালুট।

Barin Ghosal : @Umapada Kar ভাস্করের কবিতা যে এভাবে ছানবিন করা যায়, তুই দেখালি উমাপদ। তোর অ্যানালিসিস এই কবিতাকে মহার্ঘ করে তুলেছে। সাবাশ।

Barin Ghosal : খুব ভাল লাগছে। ছবিগুলো মুড বাড়িয়ে দিচ্ছে, এত ভালো সেটিং। ব্রাউজার আরো ব্যবহার- বন্ধু করলে ভাল হয়। চেঞ্জ ওভারের সময় অসুবিধা হচ্ছে।

Ranjan Mitra : @Barin Ghosal তোমার বারান্দাটা আমারও ভেতর দিয়ে গেল বারীন দা। তারপর নয়েজের তারে তারে শিশুহাসির ধারণার মধ্যে হাসপাতালের অ্যানিমেশন। উইন্ডো গবাক্ষ জানালার ঝড়েও শান্ত মগডাল। কেবল খালি বোতলের মধ্যে ছোট্ট আগুনের দপ, কেবল বাড়ি ফিরে চলোর ফুলঝুরি। আর আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর অ্যানিমেশনে পায়েরও ঘুরে দাঁড়ানো এই শিক্ষা, কার্টুন মন, ইথার, সুলতা, বস্তুত আমাদের বাড়িটাই যা এঁকে ফেলতে চাই এক জীবনে। কেয়া বাত, বারীন দা। একটা প্রণাম রইল।

Barin Ghosal : বেশ বেশ। আমার লেখারও আলোচনা কেউ করে। ধন্য হলাম মেশো।

Ranjan Mitra : @Radheshyam Ghosh ভাল লাগল । উপস্থাপনায় সামান্য নরম ভাব মেশানো যায় কিনা একটু ভেবে দেখো। কবিতার গঠন, তোমার নিজস্বতা সব অবিকল রেখে সামান্য free- flow আনা যায় কিনা।

Radheshyam Ghosh : চাপ হয়ে গ্যাছে বুঝতে পারছি রঞ্জনদা। থুৎনির মুন্ডি দ্যাখে অন্ড খন্ড স্পিরিটাস - এগুলো schemed, এই phonetic discord টা আমাকে ছাড়ছিল না। এই flavourটা serve করলাম, জৈব প্রয়োজনের মতো। আর free- flow কোথাও আটকে যায়, কোথাও আটকে দি। সব লেখাতো এক নয়। আপনি জানেন। তবে আপনার কমেন্ট লেখা সব লক্ষ্য করছি, এই পাঠ 'বিশেষ' ।

Debasis De : অসাধারণ, খুব ভালো লাগলো।

Ranjan Mitra : @Yashodhara Ray Chaudhuri পরবর্তী এপিসোডে সে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছে- - - এই পঙক্তিতে এসে পুরো কবিতাটি আবার পড়া হয়ে যায় আপনা আপনিই।

Ranjan Mitra : @Dhiman Chakraborty আমরা ধীমানের বন্ধুরা এই কবিতাটির পূর্বাপর সবই শুনেছি ধীমানের মুখ থেকে, সে অনেকদিন হোল। আজ আবার সেই সব দিন ছুঁয়ে গেল।

Ranjan Mitra : @Anindita Gupta Roy খুব সুন্দর লাগলো অনিন্দিতা। যেসব ছুরি, কাঁচি, চেতনানাশক, গজ, ড্রিপ আমাদের জানলাগুলোকে নোংরা করে দেয়, বন্ধও, তাদেরকে কুয়াশায় পাইনে চড়াইএ বস্তিতে আর বাঁচিয়ে তোলা নদীখাতে ফেলে নতুন করে আবিস্কার করার চেষ্টা, নিজের প্রাণের মাঝে যে সুধা চিরজীবী তাকে অন্য আঙুলে ছোঁয়ার চেষ্টা, ভাল লাগলো।

Anindita Gupta Roy : Ranjan da. . . . chokh vijiye dile

Radheshyam Ghosh : @Barin Ghosal বারীনদার দুটি কবিতা। প্রথমটি ছায়াভাষায়, ২য় টি মোটামুটি কায়ায়। দুটি কবিতায় খুব নির্ভার

সহজতায় সংযোগে ধরা দ্যায়। আয়োজনে কোন জাঁক নেই। চটিত চটুল শব্দ বারে বারে একটা বিরাট ক্যানভাসে কেন জানিনা বিষণ্নতা ঝুলে থাকে। তিছোট্ট এক পা, চটিত চটুল শব্দ, দূর বিন থেকে বাতাস, বিশেষ করে "হেলেছে" শব্দটি, তার পরের লাইনে বাড়ি নিয়ে যা হয়েছে, তাতে বাড়িকে অনন্ত ছাদ দিয়েছে। ছায়াভলক, নয়েজ ইলেকটনি, জানালাকার আয়তছবি, অচেনা ঘুঘুর বাড়ি ফিরে চলো পায়রা পারারা - ছায়াভাষায় লেখা আসলে এ এক অভিযাত্রির খাতা থেকে। শব্দ, দৃশ্য, মনবর্তি ছায়াদের ধুম লেগেছে অ্যানিমেশনে, কার্টুনে।

Debasis Mukhopadhyay : কবিতা তার আপনগুণে ভাস্বর

Radheshyam Ghosh : @Barin Ghosal একদিন মধ্যরাতে ইশ্বরের ভেতর মানে এবং গন্ধের ভেতর নাম সেঁধোলো। শহরের নামগুলো প্রিয়বন্ধুর নামে বদলে যায়, কিন্তু আজও আমার কোন শহর হলো না সুলতা।

Ahmed Swapan Mahmud : অাপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

Ghalib Islam : পরের সংখ্যার জন্য অপেক্ষায় থাকছি।

মলয় প্রামাণিক : @Pijush Biswas আপনার এই কবিতাটি আমি আগেও পড়েছি। অসাধারণ লিখেছেন। নিজের কবিতার বিশ্লেষণও ভীষণ ভাল লেগেছে। অসাধারণ প্রকাশভঙ্গি আপনার! পাঠকের কাছে অধরা জায়গাগুলোতে এমন সুন্দরভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন, আশাকরি সমস্ত পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করবেই! সব মিলিয়ে দারুণ, অস্যাম্...'আউট অব্ মার্জিন' !

Ranjan Moitra : @Pijush Biswas অসাধারণ পীযূষ । মার্জিন অতিক্রম করে যাওয়া এই ভাবনাচলন এবং সেই পথেই নির্মিত কবিতাটি স্রেফ মুগ্ধ করে দিল। বেলুনের পেটে বাড়ছে শিশু হনুমান- চমৎকার। একটি মূল ভাবনাসুত্রকে বহুমাত্রিক ভাবনা এবং স্রোতের অনুষঙ্গে অনায়াসে মিশিয়ে দেওয়ার এই পরীক্ষায় উজ্জ্বল হয়ে আছে তোমার কলমটি। অভিনন্দন।

Ranjan Moitra : @Ramit Dey গোটা লেখাটাই, কবিতা এবং গদ্য খুব ভাল লাগলো রমিত। আশীর্বাদ তোকে। আর প্রাণভরে হিংসেও করছি, তোকে, কারণ এরকম গদ্য আমি জীবনেও লিখতে পারব না।

Debjani Basu : @Debadrita Bose Ekta natun jagater sandhan pelamar Umapada dar matoi amar obastha Debadrita tomar boi porte bhishan ichchhe korchhe.

Umapada Kar : আমি তো দেবাদৃতার বই পড়েছি।

Debadrita Bose : থ্যাংক ইউ দেবযানী দি, না উমা দা, দিদি মনে হয় পীযূষদার কথা বলতে চেয়েছিল।

Sailen Saha : @Pijush Biswas পীযূষ, ভালো লাগলো কবিতা। ভালো লাগলো এই চলমানতা । ভালো লাগে শূন্যকালের হাত ধরে এই শূন্যমার্গে বিচরণ। সবকিছু তো শূন্য থেকেই শুরু আবার শূন্যেই বিলীন। সুতরাং আমাদের এই ভাবে অনন্তকালের অতিথি হতেই বা আপত্তি কোথায় ! কবিতার সফরচারী এখন বহু মানুষ, কে কে কবি সেটা অবশ্য আমার দেখার উপায় নেই । আর আমার দায়ও নেই । তবে আকস্মিক ভালো লাগাকে কবিতা বলেই চিনি, তাই ব্যাকরণের মাস্টার হলেই কবিতার সব কিছু জানা যায় কিনা আমার জানা নেই । আর শরীর ব্যবচ্ছেদে হৃদয় খুঁজে ডাক্তারেরাও পান কিনা আমি জানি না । এমনকি হৃদয় কোথায় থাকে না জেনেই আমরা হৃদয় দিয়ে বসে থাকি । কি করে এই দেয়া নেয়া চলে কবিরাও কি বলতে পারবেন ! আমি ভাবের ঘরে বন্দী হয়ে আছি, কবি বলার সাহস নেই নিজেকে - - তাই কবিদের কাছে এই জিজ্ঞাসা রেখেই আমার আত্মকথন শেষ করলাম । কিছু ভুল বলে থাকলে, তা নিয়ে আবার বিচার সভা ডাকবেন না, কানে কানে বলে দেবেন - শুধরে নেব । সারা জীবনটাই তো শেখার জন্য শূন্য ঘরে বসত করি - - খাঁ খাঁ করা অনুভবে শূন্যকালকেই আশ্রয় করলাম। ভাল থাকবেন ।

Pijush Biswas : @Arjun Bandyopadhyay আমি অরুণেশ ঘোষের কবিতা পড়িনি, আসলে আমি অনেক কবিরই কবিতা পড়িনি । সময় সুযোগ যতটুকু হয়, ব্যবহার করি । যারা এদিক দিক থেকে উকি দেয় তাদের লেখা পড়ার সৌভাগ্য হয়। অর্জুনের কাছে এই লেখাতে দুটো জিনিস হলো, এক অরুণেশ ঘোষএর কবিতা সম্পর্কে একটা আইডিয়া হলো, আর কৌতূহলও বাড়ল । আমি তো অর্জুনের লেখার প্রশংসা করছি, সেই সাথে ওর পরিশ্রমী সত্তাকে স্যালুটও করছি, ভালো কাজ করে যাচ্ছে হে অর্জুন, তোমার তীর মোক্ষম জায়গাতে লেগেছে !

Radheshyam Ghosh : @Rabindra Guha অনেক কবিতাতেই এচোড় পেঁচোড় আছে এখানে। এ কবিতাটি পথ হারানো পথ খোঁজার মধ্য দিয়ে, সুন্দরের রহস্যময় ভৌগলিকতা উদযাপন করে বহুদিশাময় হয়ে গেল. . . . . .

Ranjan Mitra : @Rabindra Guha "আগুন"

Ranjan Mitra : @Swapan Roy মোটিভ টাই আসল রাজা। লোকো/ লোক বা অলোক । কত কিছু যে পড়তে থাকে এক জীবনে ! মদ বৃষ্টি উর্দু পাতা কিম্বা আঠা । আর কল্পনার এক রাবার বন ঘনিয়ে আসে, জড়িয়ে আসে, বাড়িটার চার পাশে। আর গীটার বাজে, ওই মাথাতেই। দেরী বা তাড়াতাড়ি আলাদা করা যায় না। ভাবিয়ে তুললি স্বপন।

Ranjan Mitra : @Japamala GhoshRoy সিরিঞ্জ দারুণ লাগলো।

Ranjan Mitra : @Indranil Ghosh লাভ ইউ

Ranjan Moitra : @Nabendu Bikash Roy বেশ বেশ

Ranjan Moitra : @Avi Samaddar কথন- ৯ চমৎকার

Ranjan Moitra : @Dipankar Dutta ক্রিয়া- দোর ভেঙে চাকনাচুর করে দিয়েছিস। জিও।

অভি সমাদ্দার : অশেষ ধন্যবাদ, রঞ্জনদা।

Swapan Roy : @Barin Ghosal এমন কবিতা এক জীবনেই যদি আসে, জীবন আনন্দের হবে না?

Swapan Roy : @Rabindra Guha রবীন দা, কি লিখেছো! সালাম! !

Swapan Roy : @Avi Samaddar অভি চলনের অনভিপ্রায়ি দিকটি টানলো!

অভি সমাদ্দার : ধন্যবাদ স্বপনদা।

Swapan Roy : @Dipankar Dutta দীপঙ্কর এক অনিবার্য বিস্ফোরক, বুকের পাটা না থাকলে এ ভাবে লেখা যায়না! এই তোয়াক্কাহীন লেখার জন্য ভাইরে একটা ঝাপ্পি তোলা রইলো!

Japamala GhoshRoy : জাদু কি ঝাপ্পি বল স্বপন দা wink emoticon

Swapan Roy : @মলয় রায়চৌধুরী মলয় দা, আপনার এই বৃত্তশাসন ভাল লাগলো, প্রণাম নেবেন!

Radheshyam Ghosh : দীপঙ্কর দত্তের প্রথম কবিতাটির সংগের associated paintingটির মতো এই লেখাগুলো প্রথা, অভ্যেস, কবিতার নির্মম হত্যালীলা। জলকে ঘুলিয়ে তুলে অতলের আঁতিপাতি।

Limon Mehedi : @Rabndra Guha "Bah. . . ."

Manas Chakraborty : @Barin Ghosal বারীনদার কবিতার চলনের মজা...আহা. . . !

Manas Chakraborty : @Rabindra Guha শূন্যকালে জ্যান্ত শব্দ রুইয়ে দিলো ...সুন্দরের শরীর আদ্যন্ত বাস্তব রহস্যময়. . .

Manas Chakraborty : @মলয় রায়চৌধুরী সৌন্দর্য মানেই যেন আত্মবলিদান...একটু আগেই সুন্দরের শরীর আদ্যন্ত বাস্তব রহস্যময় জেনে গলি পেরবার মুখে আত্মবলিদানের ঢিল পোড়লো . . . কোথায় যেন যোগসাজস ...রবীন দা আর মলয় দার
অপূর্ব সৃষ্টিতে . . . .

Manas Chakraborty : @Indranil Ghosh আহা. . . !

Manas Chakraborty : @Avi Samaddar বাঃ

Manas Chakraborty : @Diapankar Dutta ও হো !

Japamala GhoshRoy : পুরোটাই পড়লাম। এবার আরও ভালো লাগলো। প্রচ্ছদ ভিতরের ছবি সব নিয়ে দারুণ একটা ঝকঝকে। আরও ভালো লাগছে উত্তরোত্তর পত্রিকার ভাবনা & ঋদ্ধি নিয়ে সম্পাদক মহাশয় এর নিরলস প্রয়াস। ধন্যবাদ আমার লেখা ছাপার জন্য।

Radheshyam Ghosh : @মলয় রায়চৌধুরী Typical. Beautiful libidona extracts. Libidonal, libidonil & libidolin. . . . . .

Yashodhara Ray Chaudhuri : Thanks Ranjan Mbitra, thanks Shunyakaal Webzine. . .

Debjani Basu : Japomala tomar kabitar sathik mulyayan hoyeche amar prio kabider dwara bolei mone kori ami

Ranjan Mbitra : @Debadrita Bose রেল লাইন থেকে উঠে আসা মানুষ / ছুঁলেই ট্রেন হয়ে ওঠা যায় - - সেই হয়ে ওঠা আমারও হল। তোর এই জার্নির আমিও সঙ্গী । ট্রেন হয়ে, যাত্রী হয়ে, দরজার সামান্য ফাঁক দিয়েও । কবিতাটা তো ভাল লিখেছিস। গদ্যটা অসামান্য। আশীর্বাদ।

Debadrita Bose : থ্যাংক ইউ। smile emoticon

Japamala GhoshRoy : খুব৩ ভালো রে দেবাদৃতা

Debjani Basu : @Michie Ulka Tor dreamcatcher dhore cchutleo Ami jokar hote chaibo na jokarra ekta Sahar dhwansa korte pare. Tui magic wand ghuriye ghurie metamorphosis er parba eker por ek dekhiyechhis gota kabita jure. Byathar ekta prachchhanna chadar jarano kabitatay othocho krodh kothao lukiye nei.

Ranjan Mitra : @Debjani Basu সোনার স্মৃতির মুন্ডহীন ফিরে আসা, একলা দুপুরকে স্মৃতিকাতর করে তোলা ডাকের পাখিটির অন্য দেখার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠা, কোথায় যেন এক হয়ে যায় প্রবাদের নারী আর প্রবাদের ঘুঘু, জ্বলে ওঠে প্রতিবাদের আগুন, ডাক দেয় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পাহাড় হতে। আর ভাবনায়, চলার পথে বারবার বেঁচে ওঠে সেইসব বৃষ্টি আর শিলারা যাদের মোহিনী আট্যমই সেই নির্মাণ যা স্বপ্নে সমাজে কবিতায় হয়ে ওঠার লক্ষ্য লেগে থাকে কবির কলমে। অসাধারণ গদ্যটি কবিতায় নিএ গেল হাত ধরে ।

Debjani Basu : Etao kabyik expressionja barsar anander sange .....

Ranjan Mitra : খুব পরিণত ও সংহত উপস্থিতি এবারের শূন্যকাল- এর। অনেক শুভেচ্ছা দীপঙ্করের জন্য।

Ranjan Mitra : @Joyshila Guhabagchi এইই সম্ভাবনার কবিতা। তাই স্নায়ুর ভেতর জন্ম বেজে ওঠে। জন্ম হওয়ার চেয়ে যা অনেক তাৎপর্যের, অনেক সুদূরপ্রসারী। তাই নেত্রনালী থেকে শিশু ঝরে। চমৎকার লাগলো জয়শীলা ।

Ranjan Mitra : @Arjun Bandyopadhyay খুব ভাল লিখেছিস অর্জুন। যে প্রশ্ন ও সংশয় কবি নির্মাণ করেছেন কবিতার শরীরে তুই তা ছাড়িয়ে নিজের প্রশ্ন নির্মাণ করেছিস আর উত্তর খুঁজেছিস এবং পরিপূরণ খুঁজেছিস দ্বিতীয় কবিতার কাছে। ব্রেভো।

Ranjan Mitra : @Umapada Kar বাহ। খুব ভাল গদ্য।

Sharbaaniranjan Kundu : @Japamala GhoshRoy Abasyai uttaradhunik. Tabe prathamkabitatar bhetare kothay jeno Shakti Chattopadhyay lukiye achhen!

Japamala GhoshRoy : @Sharbaaniranjan Kundu শক্তি চট্টোপাধ্যায় কেন, লুকিয়েই বা কেন? প্রকাশ্যেই "নবারুণের পর তাঁর উপত্যকা"

কবিতায় অনেকেরই প্রভাব এসে গেছে। আনা হয়েছে। কেননা এটা শংসাকাব্য। এর একটা নিজস্ব চরিত্র থাকে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শংসায় যে প্রাণহীন প্রশস্তি মাত্র থাকে তা আমি আন্তরিক প্রচেষ্টায় অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি হারবার্ট কে নিয়ে আমার তীব্র সংবেদন থেকে। ধন্যবাদ। খুব৩ ভালো থাকবেন। Ranjan Moitraদা Barin Ghosalদা. Thanks a l ot .

Japamal a GhoshRoy : কোন কবিতা কারও ভালো লাগলো না বা কবিতাটা তাঁকে তেমন আক্রান্ত করল না সেটা শিরোধার্য বিষয়। এটা হতেই পারে। এটা নিয়ে কোন তর্ক চলে না। রবি ঠাকুর শংসাকাব্য লিখছেন "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার.... " এই কবিতাটা কারও ভালো না ই লাগতে পারে অন্যান্য কবিতার তুলনায়। যুগে যুগেই শংসাকাব্য লেখা হয়। বাণভট্টের হর্ষচরিত ও শংসাকাব্য। কিন্তু যখনি আপনি বলবেন অমুকেরটা অমুকের মতো বা এটাতে অমুক বাবু লুকিয়ে আছেন সে ক্ষেত্রে আপনাকে উল্লেখ করে দিতে হবে কোন বাবু কোথায় কি ভাবে লুকিয়ে আছেন। যাতে আমাদের মতো দীন "শক্তিপাঠক" (?) বুঝে নিয়ে সেটা পরবর্তী কালে বর্জন করার শিক্ষাটা পাই। Sarbaaniranjan kundu বাবু wi nk emot i con

Mbul i nat h Bi swas : @Japamala GhoshRoy পরিপূরক ও পরিসর থেকে 'পরি'- কে পাখা মেলে উড়িয়ে দিলে যা পড়ে থাকে এই কবিতা দুটো তাই! !
(যত- ই প্রয়োজন হোক আমি কখনো কবিতায় 'সফেন' শব্দটা ব্যবহার করি না। কারণ কোনো পাঠকের জীবনানন্দ- কে মনে পড়তে পারে।)
ধন্যবাদ মাননীয়া জপমালা, মাননীয় দীপঙ্কর। শুভেচ্ছা।

Bar i n Ghosal : কোন শব্দই কারো পেটেন্ট না। ব্যবহারের ওপর আলাদা হওয়া নির্ভর করে মৌলিনাথ।

Pal ashkant i Bi swas : @Pijush Biswas দেরিতে পড়লাম। কবিতা নয়, কবিতা সম্বন্ধে বক্তব্য, তার সূতিকাগৃহের খবর। কবিতা আগেই পড়া ছিল। তেমন ধরা দিচ্ছিল না। আলোচনাটা একেবারে যেন ছবি তুলে ধরল- - শুধু কবিতার নয়, কবির মন- উপত্যকারও। আমার মনে হয় আরও অনেক কবি, অ- কবি বা অন্য মানুষেরও। এমনকি সভ্যতারও ক্রমবিকাশের একটা চিত্র এটা। ভালো লাগল। বয়স, পাঠ, লোক- সঙ্গম, অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান, বোধ, ধারণা, দৃষ্টিকোণ আর সেগুলো প্রকাশের ধরণ, ভঙ্গিমা, উপস্থাপনা, শব্দচয়ন, বাক্য বা বাক- প্রতিমা গঠন এ সবের উপর দখল ও কর্তৃত্ব বাড়ে। আগ্রহ, অভিনিবেশ, পরিশ্রম, বিশেষ দক্ষতা (কেউ কেউ প্রতিভা বলতে পারেন) একসঙ্গে সংবদ্ধ হলে বহুদূর যাওয়া যায়, প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি জুটুক বা না জুটুক। পীযূষ বড় হয়েছে নিশ্চয়। অনেকের কাছে সেটা সত্যি। কিন্তু আমার কাছে সেটা অন্য মাত্রার। আমি দেখছি ও বড় হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে, প্রবীণ হচ্ছে, জ্ঞানী হচ্ছে। হ্যাঁ, কবিও হচ্ছে। আসলে ভালো কবি হওয়ার জন্যে ওগুলো দরকার। ওর কবিতা অনেক পড়েছি। হয়তো সব নয়, হয়তো অন্য সবার চেয়ে বেশি। ওর বিবর্তন ও অল্পকালের মধ্যে ওর বর্তমান অবস্থানে উপস্থিত হওয়া কম কৃতিত্বের নয়। কবিতার প্রতি ভালবাসা, আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমের জন্যেই এটা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কবিতা নয়, এখানে আমি মুগ্ধ হচ্ছি ওর গদ্যরচনার জন্যে। ভাবনায় গভীর, স্বচ্ছ আর ভাষায় উপযুক্ত দখল থাকলেই সেটা সম্ভব। একটা পীযূষ থেকে সম্ভাব্য সবকটা পীযূষ বেরিয়ে আসুক। আমার শুভেচ্ছা, ভালবাসা, অভিনন্দন, আদর ও আশীর্বাদ।

Pal ashkant i Bi swas : খুবই ভালো লেগেছে। দীর্ঘস্থায়িত্ব কামনা করি।

Arun Chakraborty : @Japamala GhoshRoy কবিতায় সমসাময়িকতা অহরহ মেলে না। অথচ তার জন্যই আমার পাঠক মন ঘুরে মরে। জপমালার একটা বইই পড়েছি, একবার বইমেলায় পেয়েছিলাম। তা নিয়ে আমার অভিভূত পাঠপ্রতিক্রিয়া লিখেওছিলাম। ফেসবুকে অবশ্য। 'সিরিঞ্জ' পড়ে আবার আমার ঝিমুতে থাকা পাঠক সত্ত্বা গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। জপমালা আপনি এই সময়ের এক ব্যতিক্রমী কবি। মাটি ও মানুষের সঙ্গে আপনার গা- স্পর্শ যোগাযোগ, কবিতায় নয়। আপনার কবিতা আমার কাছে বাস্তবতা জানার কোন মাধ্যম না, আপনার এই কবিতা একটি বাস্তব অবস্থান। আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

Japamala GhoshRoy : অরুণ দা, আমি চেষ্টা করি নতুন কিছু করতে। কাটুম কুটুম করেই যাই। কিছুতেই অতৃপ্তি যায় না। মনে হয় "হল না হল না"। আপনাদের মতো মানুষ যখন বলেন "একটু আধটু হচ্ছে" তখন বুকে বল পাই। কাজটা করে যেতে ইচ্ছে করে। ধন্যবাদ। আপনার মন্তব্য আমার পাথেয়।

Satyajit Ghosh : মলয় রায়চৌধুরী আপনাকে প্রণাম। অসাধারণ কবিতাখানি।